মডেল টেস্ট-এর উত্তরমালা

পৌরনীতি ও নাগরিকতা

মডেল টেস্ট- ০১

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	N	২	K	৩	N	৪	K	৫	M	৬	K	৭	M	৮	K	৯	N	১০	M	১১	L	১২	K	১৩	L	১৪	N	১৫	K
	১৬	L	১৭	M	১৮	L	১৯	K	২০	K	২১	K	২২	M	২৩	N	২৪	K	২৫	M	২৬	N	২৭	K	২৮	K	২৯	M	৩০	N

সৃজনশীল

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ই. এম. হোয়াইট প্রদত্ত পৌরনীতির সংজ্ঞাটি হচ্ছে 'পৌরনীতি হলো জ্ঞানের সেই মূল্যবান শাখা, যা নাগরিকতার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এবং স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানবতার সাথে জড়িত সকল বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে'।

খ একটি রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতাবলে অন্য রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থাকতে পারে।

সার্বভৌমত্ব একটি রাষ্ট্রের চরম, চূড়ান্ত ও সর্বোচ্চ ক্ষমতা এবং রাষ্ট্র গঠনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বাহ্যিক সার্বভৌমত্বের দ্বারাই রাষ্ট্র ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষাসহ বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকে। অর্থাৎ অন্যদেশের প্রভাব থেকে নিজেদের দেশকে রক্ষা করাই সার্বভৌমত্ব।

গ মি. রহিমের সংস্থাটির উৎপত্তির সাথে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত বল বা শক্তি প্রয়োগ মতামতের মিল রয়েছে।

বলপ্রয়োগ মতবাদের মূল বক্তব্য হলো বল বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে এবং শক্তির জোরে রাষ্ট্র টিকে আছে। এ মতবাদে বলা হয়েছে, সমাজের বলশালী ব্যক্তিরা যুদ্ধবিগ্রহ বা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে দুর্বলের ওপর নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্র গঠন করে এবং শাসনকার্য পরিচালনা করে। আরও বলা হয়, সৃষ্টির শুরু থেকে আজ অবধি এভাবেই যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। ডেভিড হিউম ও জেলেনিক এ মতবাদে বিশ্বাসী। এ সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জেংকস বলেন, "ঐতিহাসিক দিক থেকে দেখা যায়, আধুনিক সকল রাষ্টই সার্থক রণকৌশলের ফলশ্রুতি।"

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এ বলা হয়েছে, মি রহিমের সংস্থাটি গঠিত হয়েছে সবল ও শক্তিশালী ব্যক্তি প্রধানের মাধ্যমে। সবল ও শক্তিশালী ব্যক্তিরা দুর্বল ও অসহায় সদস্যদের উপর তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এরূপ বর্ণনায় রাষ্ট্র সৃষ্টির বল বা শক্তি প্রয়োগ সংক্রান্ত মতবাদের প্রতিফলন ঘটেছে। কেননা এ মতের মূলকথা হলো শক্তি বা বল প্রয়োগের মাধ্যমে সবলরা দুর্বলের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে রাষ্ট্র গঠন করে।

ঘ মি. সোবহান ও পাপন সাহেব কাজের মধ্যে সোবহান সাহেবের কাজের গুরুত্ব বেশি বলে আমি মনে করি।

পরিবারের সদস্যদের সুন্দর ও নিরাপদ জীবন গড়ে তোলার জন্য পরিবার বহুবিধ কাজ করে থাকে। পরিবারের সদস্যদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রভৃতি চাহিদা পূরণের দায়িত্ব পরিবারের। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্নভাবে অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে এ চাহিদা পূরণ করে থাকে। এছাড়া পরিবার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নানা রকম শিক্ষামূলক কাজও সম্পাদন করে থাকে। প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে পরিবর্তিত পরিবার তার সদস্যের শিক্ষিত করতেও নানামুখী কাজ করে থাকে।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২ এ বলা হয়েছে, সোবহান সাহেব সংসার পরিচালনার জন্য একটি গ্রাম্য সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে তরিতরকারির ব্যবসা করেন। অপরদিকে পাপন সাহেব ছুটির দিনে তার ছেলেমেয়েকে নিয়ে বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান ঘুরতে যান। এতে তার সন্তানরা খুবই উজ্জীবিত হন। এরূপ বর্ণনায় সোবহান সাহেবের কাজে পরিবারের অর্থনৈতিক কাজ এবং পাপন সাহেবের কাজটি পরিবারের বিনোদনমূলক কাজের অন্তর্ভূক্ত। এই দুইটি কাজের মধ্যে আমার কাছে সোবহান সাহেবের কাজের গুরুত্ব বেশি। কারণ তার কাজের মাধ্যমে পরিবারের ভরণপোষণসহ অন্যান্য কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের জোগান নিশ্চিত হয়। কারণ অর্থ ছাড়া পরিবারের কোনো কাজ সুসম্পন্ন হয় না।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, পরিবারের সমস্ত কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে পরিবারের অর্থনৈতিক কাজ সর্বাপেক্ষা বেশি প্রভাব ফেলে। কারণ অর্থনৈতিক কাজের মাধ্যমে পরিবারের অন্যান্য কাজগুলো অর্থবহ হয়ে ওঠে।

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুনাগরিকের গুণ তিনটি।

খ আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক বোঝাতে গিয়ে ইংরেজ দার্শনিক জন লক বলেছেন, 'যেখানে আইন নেই, সেখানে স্বাধীনতা নেই।'

আইন স্বাধীনতার রক্ষক হিসেবে কাজ করে। যেমন– আমাদের বাঁচার স্বাধীনতা আছে। আইন আছে বলেই আমরা সকলে বাঁচার স্বাধীনতা ভোগ করছি। আইনের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ব্যক্তির স্বাধীনতা ভোগের ক্ষেত্রে বাধা অপসারিত হয়। যদি আইন না থাকত তাহলে সবল কর্তৃক দুর্বলের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হতো। তাই জন লক যথার্থই বলেছেন, 'যেখানে আইন নেই, সেখানে স্বাধীনতা নেই।'

গ উদ্দীপকে রাবেয়া বাসরীর চরিত্রে সুনাগরিকের গুনাবলি ফুটে উঠেছে।

রাষ্ট্রের সব নাগরিক সুনাগরিক নয়। আমাদের মধ্যে যে বুদ্ধিমান, সে সকল সমস্যা অতি সহজে সমাধান করে। যার বিবেক আছে, সে ন্যায়-অন্যায়, সৎ-অসৎ বুঝতে পারে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকে। আর যে আত্মসংযমী, সে বৃহত্তর স্বার্থে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করতে পারে। এসব গুণসম্পন্ন নাগরিকদের সুনাগরিক বলা হয়। সুনাগরিকের প্রধান ৩টি গুণ থাকে। যথা– বুদ্ধি, বিবেক ও আত্মসংযম।

উদ্দীপকের রাবেয়া বাসরীর মধ্যে সুনাগরিকের সব গুণ বিদ্যমান। রাবেয়া বাসরী বুদ্ধিমান হওয়ায় সন্তানদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছেন। একজন বিবেকবান নাগরিক হিসেবে তিনি সংসারের আর্থিক উন্নয়নের জন্য কুটির শিল্প গড়ে তোলেন এবং একসময় প্রচুর অর্থের মালিক হন। এছাড়া তিনি সব লোভলালসার ঊর্ধ্বে থেকে তার আয় হতে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেন, যা তার আত্মসংযম গুণের পরিচায়ক। এভাবে রাবেয়া বাসরীর মধ্যে সুনাগরিকের সব গুণাবলি ফুটে উঠেছে। সুতরাং বলা যায়, রাবেয়া বাসরীর চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলি বিদ্যমান।

ঘ উদ্দীপকের রাবেয়া বাসরীর মতো বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন নারীরা উন্নত জাতি গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারেন– উক্তিটি যথার্থ।

বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিক মাত্রই পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পদস্বরূপ। বিবেক, বুদ্ধি হলো সুনাগরিকতার অন্যতম প্রধান গুণ। আর সুনাগরিক হলো উন্নত জাতি গড়ার পূর্বশর্ত। বুদ্ধিমান নাগরিকরা বহুমুখী সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। সুনাগরিকের বুদ্ধির ওপর আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সফলতা নির্ভর করে। তাই বুদ্ধিমান নাগরিককে রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আর বিবেকের চর্চা সমাজ থেকে অন্যায়-অবিচার দূর করে নির্মল-পরিচ্ছন্ন সমাজ গঠন করে থাকে।

উদ্দীপকের রাবেয়া বাসরীর মতো বেশি পড়ালেখা না করা নারীর সংখ্যা আমাদের দেশে অগণিত। রাবেয়া বাসরীর মতো নারীরা যদি স্বীয় বুদ্ধিমত্তা

খাটিয়ে উৎপাদনশীল হয়ে ওঠে তবে নারী-পুরুষ উভয়ের অবদানে দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে। পাশাপাশি নিজেদের সন্তানদেরও সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। যা উদ্দীপকের রাবেয়ার ক্ষেত্রে ঘটেছে। সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় কোষাগারে কর জমাদানের মাধ্যমে বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন নারীরা দেশকেও এগিয়ে নিতে সহযোগিতা করবে। এভাবে বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন নারীরা নিজ পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র অর্থাৎ গোটা জাতিকে বদলে দিতে পারে।

সুতরাং বলা যায়, রাবেয়া বাসরীর মতো বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন নারীরা উন্নত জাতি গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারেন।

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাধারণত আইনকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

খ এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক রক্ষার জন্য যে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা হয় তাকে আন্তর্জাতিক আইন বলে।

বিভিন্ন রাষ্ট্র পরস্পরের সাথে কেমন আচরণ করবে, এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকদের সাথে কেমন ব্যবহার করবে, কীভাবে আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধান করা হবে তা আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়।

গ উদ্দীপকের আমেনার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

যোগ্যতা অনুযায়ী পেশা গ্রহণ এবং উপযুক্ত পারিশ্রমিক লাভ করাকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলা হয়। মূলত আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তির জন্য নাগরিকরা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করে। এই স্বাধীনতা না থাকলে অন্যান্য স্বাধীনতা ভোগ করা যায় না। সমাজের অন্য শ্রেণির শোষণ থেকে মুক্ত থাকার জন্য অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অতিপ্রয়োজনীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আমেনা গরিব পরিবারের মেয়ে এবং বিয়ের পর আর্থিক অভাবে তার নিজের সংসারে অভাব নেমে এসেছে। এমতাবস্থায় সংসারের অশান্তি দূর করার লক্ষ্যে আমেনা গার্মেন্টস এ চাকরি করে টাকা রোজগার করতে চাইলে তার স্বামী তাকে চাকরি করতে বাধা প্রদান করে। এক্ষেত্রে আমেনার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লঙ্ঘিত হয়েছে। কেননা তার স্বামী তাকে যোগ্যতা অনুযায়ী পেশা গ্রহণ ও উপযুক্ত পারিশ্রমিক লাভের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করেছে। সুতরাং উদ্দীপকের আমেনার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

ঘ উদ্দীপকে আমেনার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা খর্ব হয়েছে, যা সমাধানে কেবল আইনের কঠোর প্রয়োগই যথেষ্ট নয়।

আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। আইন স্বাধীনতার রক্ষক ও অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। ব্রিটিশ দার্শনিক জন লকের মতে, "যেখানে আইন থাকে না, সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না।" আইন ও স্বাধীনতার মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান থাকলেও কেবল আইনের কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে স্বাধীনতা ভোগ করা যায় না। এর জন্য প্রয়োজন সাম্য। আইনের পাশাপাশি সাম্য প্রতিষ্ঠা করা গেলে স্বাধীনতা ভোগ করা সহজ হয়। এজন্যই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হলে কঠোর আইন প্রয়োগের পাশাপাশি অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যোগ্যতা অনুযায়ী প্রত্যেকের কাজ করার ও ন্যায্য মজুরি পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। তবেই অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা হবে।

উদ্দীপকে দেখা যায় আমেনা সংসারের অভাব ও অশান্তি থেকে মুক্তির লক্ষ্যে গার্মেন্টসে কাজ করতে চাইলে তার স্বামী তাকে চাকরি করার সুযোগ দেয়নি। অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলে এভাবে কাউকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যায় না।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, কেবল আইনের কঠোর প্রয়োগেই অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য যথেষ্ট নয়। আইনের পাশাপাশি অর্থনৈতিক সাম্যও প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সুতরাং প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ হয়েছে।

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সরকারের সমস্ত কার্যাবলি একটিমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় তাকে এককেন্দ্রিক সরকার বলে।

খ গণতন্ত্র হলো জনগণের কল্যাণার্থে পরিচালিত শাসনব্যবস্থা। একারণে একে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা বলা হয়।

গণতন্ত্র হলো এমন একটি শাসনব্যবস্থা যেখানে শাসনকার্যে জনগণের সকলে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং সকলে মিলে সরকার গঠন করে। এটি জনগণের অংশগ্রহণে, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের কল্যাণার্থে পরিচালিত শাসনব্যবস্থা। এখানে মতপ্রকাশ ও সরকারের সমালোচনা করার সুযোগ থাকে। এ শাসনব্যবস্থায় সকলের স্বার্থরক্ষার সুযোগ থাকে এবং নাগরিকের অধিকার ও আইনের শাসনের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। মূলত এসব বিষয়কে কেন্দ্র করে বলা যায়, গণতন্ত্র হলো সকলের মঙ্গলের জন্য পরিচালিত সরকারব্যবস্থা।

গ তথ্য-১ এ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলতে সেই ধরনের রাষ্ট্রকে বোঝায়, যা ব্যক্তিমালিকানা স্বীকার করে না। এতে উৎপাদনের উপকরণগুলো রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকে। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে উৎপাদন ও বণ্টনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বিপরীত। সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করা হয় না। এ ধরনের রাষ্ট্রে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল থাকে। গণমাধ্যম রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে থাকে। বিরোধী মত প্রচারের সুযোগ থাকে না।

উদ্দীপকের তথ্য-১ এ বর্ণিত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় (i) সম্পত্তিতে ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত নয়; (ii) উৎপাদন রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকে; (iii) সম্পত্তি ভোগে স্বাধীনতা নেই। এরূপ বৈশিষ্ট্যগুলো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাকেই তুলে ধরে। কারণ একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কখনও ব্যক্তিমালিকানা স্বীকার করা হয় না। রাষ্ট্রের সম্পত্তির মালিক হয় রাষ্ট্র। সেখানে ব্যক্তির সম্পত্তি ভোগের স্বাধীনতা দেওয়া হয় না।

ঘ তথ্য-২ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ইঙ্গিত করে যা অধিক জনপ্রিয়।

পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বলতে সেই রাষ্ট্রকে বোঝায়, যেখানে সম্পত্তির উপর নাগরিকদের ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করা হয়। এ সরকারব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদানসমূহ (ভূমি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপনা) ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকে। এর উপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। এ ধরনের রাষ্ট্রে নাগরিকগণ সম্পদের মালিকানা ও ভোগের ক্ষেত্রে স্বাধীন। বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রই পুঁজিবাদী।

উদ্দীপকের তথ্য-২ এর তথ্যগুলোয় বলা হয়েছে, উক্ত রাষ্ট্রে সম্পত্তিতে ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত; অবাধ প্রতিযোগিতা ও সম্পত্তি ভোগে স্বাধীনতা রয়েছে– এখানে স্পষ্টত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের কথা বলা হয়েছে। এটি আধুনিক বিশ্বের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ও জনপ্রিয় শাসনব্যবস্থা। কেননা

পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদানসমূহ (ভূমি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপনা) ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকে। এর ওপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। এ ধরনের রাষ্ট্রে নাগরিকগণ সম্পদের মালিকানা ও ভোগের ক্ষেত্রে স্বাধীন। একারণে সারাবিশ্বে পুজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা অধিক জনপ্রিয়।

আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, সম্পত্তির মালিকানায় ব্যক্তির কর্তৃত্বের কারণে সারাবিশ্বে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রচলিত। যেখানে বিশ্বের কতিপয় রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ধরে রেখেছে। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ, অর্জিত সম্পত্তিতে ব্যক্তি মালিকানার স্বীকৃতি আর অর্থনীতিতে অবাধ প্রতিযোগিতা বিদ্যমান থাকায় সমাজতন্ত্রের তুলনায় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা অধিক জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সংবিধানের অধিকাংশ ধারা লিখিত থাকে তাকে লিখিত সংবিধান বলে।

খ উত্তম সংবিধানে জনকল্যাণের দিকটি অগ্রাধিকার থাকে বিধায় এটি সুষম প্রকৃতির হয়।

উত্তম সংবিধান সুষম প্রকৃতির। এর অর্থ, উত্তম সংবিধান সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের মাঝামাঝি অবস্থান করে। অর্থাৎ এটি খুব সুপরিবর্তনীয় কিংবা খুব বেশি দুষ্পরিবর্তনীয় নয়। এর ফলে উত্তম সংবিধান সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে সক্ষম।

গ 'ক' দেশের সংবিধান প্রণয়ন পদ্ধতি হলো আলাপ-আলোচনা পদ্ধতি।

সংবিধান প্রণয়নের যে চারটি পদ্ধতি রয়েছে তন্মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সংবিধান প্রণয়ন পদ্ধতিটি একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী পদ্ধতি। সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত গণপরিষদ বা আইন পরিষদ সদস্যদের আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সংবিধান রচিত হলে তাকে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সংবিধান প্রণয়ন পদ্ধতি বলে। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি

দেশের সংবিধান এভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানও ১৯৭২ সালে গণপরিষদ সদস্যদের আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে প্রণীত হয়।

উদ্দীপকে 'ক' দেশে ১৯৭২ সালে ৩৪ জন সদস্যবিশিষ্ট কমিটি সংবিধান রক্ষার দায়িত্ব নেয়। এ কমিটি এপ্রিল মাসে খসড়া সংবিধান গণপরিষদে উত্থাপন করে। ১৯ অক্টোবর থেকে ৪ নভেম্বর পর্যন্ত এ সংবিধান গণপরিষদে পাঠ করে তার পক্ষে-বিপক্ষে মত গ্রহণ করা হয় এবং তা পরিমার্জন করা হয়। এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, 'ক' দেশটির সংবিধান আলাপ আলোচনার মাধ্যমেই গড়ে উঠেছে।

ঘ 'ক' দেশটির সংবিধানের মাধ্যমে বাংলাদেশের সংবিধানের প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পেয়েছে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের জন্য ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটির সভাপতি ছিলেন ড. কামাল হোসেন। এ কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালের ১৭ এপ্রিল। এ কমিটি অক্লান্ত পরিশ্রম করে বাংলাদেশের সংবিধানের খসড়া তৈরি করে এবং তা ১৯ অক্টোবর ১৯৭২ গণপরিষদে উত্থাপিত হয়। এরপর সংবিধানের বিভিন্ন দিক নিয়ে গণপরিষদে আলোচনার পর ৪ নভেম্বর ১৯৭২ সালে সংবিধান গৃহীত হয় এবং ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হয়।

উদ্দীপকের বর্ণনায় বাংলাদেশ সংবিধান প্রণয়নের পদ্ধতি প্রকাশ পেয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানের বেশ কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বাংলাদেশের সংবিধান একটি লিখিত দলিল যাতে ১৫৩টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়। কারণ এর কোনো নিয়ম পরিবর্তন বা সংশোধন করতে জাতীয় সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতির প্রয়োজন হয়। এ সংবিধানে নাগরিক হিসেবে আমরা কী কী অধিকার ভোগ করতে পারব (জনগণের মৌলিক অধিকার) তা উল্লেখ থাকায় এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন– জীবনধারণের অধিকার, চলাফেরার অধিকার, বাক স্বাধীনতার অধিকার, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, ধর্মচর্চার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার ইত্যাদি। এছাড়াও সংবিধানে সর্বজনীন ভোটাধিকার, সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা, এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং জনগণের পক্ষে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনার কথা উল্লেখ রয়েছে।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, উক্ত দেশের সংবিধান তথা বাংলাদেশের সংবিধান অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, যেটি একটি উত্তম সংবিধান।

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারের যে বিভাগ রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ নিয়ে গঠিত তাকে শাসন বিভাগ বলে।

খ গ্রাম আদালত অধস্তন আদালতের সর্বশেষে স্তর বলে একে বিচার ব্যবস্থার সর্বনিম্ন আদালত বলা হয়।

বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থার সর্বনিম্ন আদালত হলো গ্রাম আদালত। গ্রাম আদালত ইউনিয়ন পর্যায়ে অবস্থিত। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও বিবাদমান দুই গ্রুপের দুইজন করে মোট পাঁচজন সদস্য নিয়ে গ্রাম আদালত গঠিত হয়। যেসব মামলা স্থানীয় পর্যায়ে বিচার করা সম্ভব, মূলত সেগুলোর বিচার এখানে করা হয়। ছোটখাটো ফৌজদারি মামলার বিচারও এ আদালতে করা হয়ে থাকে।

গ মি. 'B' হলেন বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতি।

রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ ব্যক্তি ও রাষ্ট্রপ্রধান। তবে রাষ্ট্রপ্রধান হলেও তিনি নামমাত্র বা আলংকারিক অর্থেই প্রধান। কেননা, দুই একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ব্যতীত তিনি রাষ্ট্রের কোনো কাজ এককভাবে পরিচালনা করেন না।

উদ্দীপকে মি. 'B' প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধি সংস্থা কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হয়েছেন। কিন্তু তিনি বেশির ভাগ কাজ করে 'F' এর পরামর্শ নিয়ে। এরূপ বর্ণনায় মি. 'B' এর সাথে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির পদটির সাদৃশ্য পাওয়া যায়। কারণ, আলংকারিক অর্থে প্রধান ব্যক্তি হলেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদসের ভোটে নির্বাচিত হন। তাঁর কার্যকাল পাঁচ বছর। তিনি পুনর্নির্বাচিত হতে পারেন, কিন্তু কোনো ব্যক্তি পর পর ২ মেয়াদের বেশি অর্থাৎ ১০ বছরের বেশি রাষ্ট্রপতি পদে থাকতে পারেন না। রাষ্ট্রপতি থাকা অবস্থায় তার বিরুদ্ধে আদালতে কোনো অভিযোগ আনা যায় না। তবে সুনির্দিষ্ট অভিযোগে অভিশংসন করা যায়। রাষ্ট্রপতি হতে হলে তাকে অবশ্যই ৩৫ বছর বয়স্ক, বাংলাদেশি নাগরিক ও সংসদ সদস্য হওয়ার যোগ্যতা থাকতে হবে।

ঘ মি. 'F' হলেন বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি। তাঁর কাজের পরিধি ব্যাপক।– উক্তিটি যথার্থ।

সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী হলেন প্রকৃত শাসক। তিনি সরকারপ্রধান। তাকে কেন্দ্র করে দেশের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ অর্জনকারী দলের নেতাই প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন।

উদ্দীপকের মি. 'F' এমন একটি পদে আসীন যার সাথে পরামর্শ করেই মি. 'B' তথা রাষ্ট্রপতি বেশিরভাগ কাজ করে থাকেন। এ থেকে বোঝা যায় তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কাজের পরিধি ব্যাপক। কারণ সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিপরিষদ প্রকৃত শাসক। প্রধানমন্ত্রী একই সাথে সংসদের নেতা, মন্ত্রিসভার নেতা এবং সরকারপ্রধান। তাকে কেন্দ্র করে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত ও এর কাজ পরিচালিত হয় বিধায় তাকে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি বলা হয়। তিনি মন্ত্রিসভার সদস্যসংখ্যা নির্ধারণ করেন ও মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন। তার নির্দেশনা অনুযায়ী মন্ত্রীরা বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। তিনি পদত্যাগ করলে সকল মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয়। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করেই রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় বিধায় প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি বলা হয়।

আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, প্রধানমন্ত্রী হলেন সংসদীয় সরকারব্যবস্থার প্রকৃত শাসক। তাঁকে কেন্দ্র করে দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় বলে তাকে শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি বলাই যুক্তিযুক্ত।

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি দেশের জনগোষ্ঠীর যে অংশ বা যারা একটি আদর্শ বা কিছু নীতি বা কর্মসূচির ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় সমস্যা সমাধানে সংগঠিত হয়, তাদেরকে রাজনৈতিক দল বলে।

খ বিরোধী দল হলো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাণস্বরূপ যারা গণতন্ত্রকে সুসংহত করতে সহায়তা করে।

রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নির্বাচনে বিজয়ী দল সরকার গঠন করে এবং দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আইনসভায় বিরোধী দল হিসেবে ভূমিকা পালন করে। সরকারের কোনো কার্যক্রম ভুল হলে বিরোধী দলের প্রধান কাজ হচ্ছে গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে সরকারের ভুলত্রুটি ধরিয়ে দেওয়া। এভাবে বিরোধী দল সরকার পরিচালনায় পরোক্ষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

গ উদ্দীপকের সোহাগ পরোক্ষ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে।

মধ্যবর্তী সংস্থা কর্তৃক প্রতিনিধি নির্বাচন করাকে বলা হয় পরোক্ষ নির্বাচন। জনগণ ভোটের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি বা একটি মধ্যবর্তী সংস্থা নির্বাচিত করেন। এ জনপ্রতিনিধিগণ ভোট দিয়ে যখন রাষ্ট্রপতি বা সংসদের সংরক্ষিত আসনের সদস্য নির্বাচন করেন, তাকে বলা হয় পরোক্ষ নির্বাচন। পরোক্ষ নির্বাচন বলতে যে নির্বাচন ব্যবস্থাকে বোঝায় সেখানে সাধারণ ভোটারগণ ভোট দিয়ে মধ্যবর্তী নির্বাচনি সংস্থা তৈরি করে। আর এই নির্বাচনি সংস্থা চূড়ান্তভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করে। যেমন– বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন।

উদ্দীপকের মি. সোহাগ যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন সেখানে ভোটার ছিলেন ঐ জেলার অন্তর্ভুক্ত সকল ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, কাউন্সিল ও উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ। এ সকল নির্বাচকমণ্ডলীর সবাই জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধি। তারাই R জেলার জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মি. সোহাগকে নির্বাচিত করেন। সুতরাং আলোচনা থেকে বলা যায়, মি. সোহাগ পরোক্ষ পদ্ধতির নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।

ঘ মি. পারভেজের সংস্থাটি হলো নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষ ভূমিকাই সুষ্ঠু নির্বাচনের পূর্বশর্ত। আমি এ উক্তির সাথে একমত।

সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনব্যবস্থা গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ। আর এ সুষ্ঠু ও

নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব থাকে নির্বাচন কমিশনের ওপর। নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করতে কমিশন নানা রকম কর্মসূচি প্রণয়ন করে থাকে। এর মাধ্যমে মূলত তারা গণতন্ত্রকে সুসংহত করার পথ তৈরি করে দেয়।

গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণের পূর্বশর্ত হচ্ছে কার্যকর নির্বাচনব্যবস্থা। এ কমিশনের দায়িত্ব হলো নির্বাচনের উপর জনগণের আস্থা অর্জনের জন্য নির্বাচন পরিচালনা, ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ, ভোটারদের পরিচয়পত্র প্রদান, আইনকর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য সকল নির্বাচন পরিচালনা ও আনুষঙ্গিক কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা। নির্বাচনে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র বাছাইকরণ, দল সম্পর্কিত নীতিমালা ও নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজও নির্বাচন কমিশন করে থাকে। নির্বাচন কমিশনের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ করা। এছাড়াও নির্বাচনি আইন তৈরি করে নির্বাচন কমিশন প্রার্থীদের দুর্নীতির পথকে বন্ধ করে দেয়। এ কারণে নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়ে থাকে।

আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, নির্বাচন কমিশন হলো একটি সংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে এর কোনো বিকল্প নেই।

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে প্রশাসনের প্রশাসককে কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োগ দেয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ বাস্তবায়নই এর প্রধান কাজ, তাকে স্থানীয় প্রশাসন বলে।

খ সরকারি ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং এ বিষয়ে নাগরিক সচেতনতা সৃষ্টির জন্য স্থানীয় সরকারের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

স্থানীয় সরকার স্থানীয় পর্যায়ে নাগরিকদের যথাযথভাবে বিভিন্ন সেবা প্রদান করতে পারে। কেন্দ্রীয় প্রশাসকদের পক্ষে সঠিকভাবে স্থানীয় জনগণের স্বার্থরক্ষা, তাদের সমস্যা সমাধান করা এবং স্থানীয় উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা অর্জন করা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে তাদের স্থানীয় সরকারের উপর নির্ভর করতে হয়। সর্বোপরি কেন্দ্রীয় সরকারকে যথাযথ নীতিমালা গ্রহণ ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করার জন্য তাই স্থানীয় সরকারের প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক।

গ জনাব চৌধুরী পৌরসভা নামক স্থানীয় সরকারের প্রধান।

গ্রামে যেমন ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামের সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখে, তেমনি শহরাঞ্চলের জন্য রয়েছে পৌরসভা। বর্তমানে বাংলাদেশে ৩৩০টি পৌরসভা রয়েছে।

উদ্দীপকের জনাব চৌধুরী একটি সংস্থার প্রধান। সারা বাংলাদেশে যার সংখ্যা ৩২৫টি। এ থেকেই বোঝা যায় তিনি স্থানীয় সরকারের অন্যতম একটি শাখা পৌরসভার প্রধান। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ অনুযায়ী একটি পৌরসভা কমপক্ষে ৯টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত হবে। তবে আয়তন ও লোকসংখ্যা অনুযায়ী পৌরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা বেশি হতে পারে। এ বিষয়ে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। আইন অনুযায়ী একজন মেয়র প্রতি ওয়ার্ড থেকে একজন করে কাউন্সিলর এবং প্রতি ৩টি ওয়ার্ড থেকে একজন করে মহিলা সদস্য সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। পৌরসভার মেয়র কাউন্সিলর হিসেবে গণ্য হন।

পৌরসভার মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বছর। পৌরসভা গঠনের পর প্রথম সভার তারিখ হতে পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বছর পর্যন্ত উক্ত পৌরসভার মেয়াদ থাকবে। তবে আইন অনুযায়ী মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও নির্বাচিত নতুন প্রতিনিধিদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত পূর্ববর্তী মেয়র ও কাউন্সিলরগণ দায়িত্ব চালিয়ে নিয়ে যাবেন।

[বি. দ্র. বোর্ড বই ২০২২ অনুযায়ী পৌরসভার সংখ্যা ৩৩০টি]

ঘ জনাব চৌধুরীর শেষোক্ত কাজ দুটি হলো– রাস্তার সৌন্দর্যবর্ধনে বৃক্ষরোপণ এবং খাদ্য ভেজাল প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ। পৌরসভার এ দুটি কাজের গুরুত্ব অত্যন্ত ব্যাপক।

পৌরসভা শহরের জনগণের স্থানীয় নানাবিধ সমস্যা সমাধানে এবং উন্নয়নমূলক কাজে দায়িত্ব পালন করে। এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে পৌরসভাকে বহুবিধ কাজ করতে হয়। এসব কাজ শহরের পরিবেশ উন্নয়নের পাশাপাশি জনগণের জীবনমান উন্নয়নেও সহায়তা করে।

উদ্দীপকের জনাব চৌধুরী পৌরসভার প্রধান হিসেবে নানাবিধ দায়িত্ব পালন করেন যার মধ্যে দুটি কাজ হলো উদ্দীপকে উল্লিখিত বৃক্ষরোপণ ও ভেজাল প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ। এ দুটি কাজের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। কারণ বৃক্ষরোপণ পৌরসভার পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও সৌন্দর্যবর্ধনে সহায়তা করে। এরূপ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির ফলে একদিকে যেমন বনায়ন বৃদ্ধি ঘটে তেমনি তা দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় ভূমিকা রাখে। অন্যদিকে খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে জনগণের সুস্বাস্থ্যের বিষয়টি নিশ্চিত হয়। এভাবে জনাব চৌধুরীর মতো প্রতিটি পৌরসভার প্রধান ভেজাল প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এই মারাত্মক সামাজিক সমস্যাটি সমাজ থেকে চিরতরে দূরীভূত হবে।

উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, বৃক্ষরোপণ ও ভেজাল প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ– জনাব চৌধুরীর এ কাজ দুটি একই সাথে জনগণের স্বাস্থ্য রক্ষা এবং পরিবেশের ভারসাম্য নিশ্চিত করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের জন্মহার মৃত্যুহারের তুলনায় অধিক হয়ে যখন বর্ধিত জনসংখ্যা দেশের সম্পদ বৃদ্ধিকে ছাড়িয়ে যায় এবং বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করে, তখন তাকে জনসংখ্যা সমস্যা বলে।

খ দেশে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষা ব্যাংক স্থাপনের নিগূঢ় যৌক্তিকতা রয়েছে।

বাংলাদেশে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার অন্যতম ও প্রধান কারণ দরিদ্রতা। অর্থের অভাবে অসংখ্য শিক্ষার্থী শিক্ষালয়ের পরিবর্তে কর্মস্থলমুখী হয় এবং অনেকে উচ্চশিক্ষা হতে বঞ্চিত হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ঋণ প্রদান অবশ্যই যৌক্তিক পদক্ষেপ।

গ উদ্দীপকে কাশেম মিয়ার আচরণের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বহুবিবাহ ও পুত্র সন্তান প্রত্যাশা তথা আর্থসামাজিক নিরাপত্তা কারণদ্বয় নিহিত রয়েছে।

আমাদের সমাজে এখনো বহুবিবাহের প্রচলন রয়েছে। ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে অনেকে একজন স্ত্রী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও আরও একটি বিয়ে করে। আবার প্রথম স্ত্রীর পুত্র সন্তান না হলে অনেকে ছেলের আশায় দ্বিতীয় বিয়ে করে থাকে। এছাড়াও পুত্র সন্তান প্রত্যাশা এদেশের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে একটি সাধারণ বিষয় হলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে এর প্রভাব ব্যাপক।

উদ্দীপকে দেখা যায়, কাশেম মিয়ার চার কন্যা সন্তান থাকা সত্ত্বেও আবার বিয়ে করে পুত্র সন্তানের আশায়। সেখানে আরও দুটি কন্যা সন্তান জন্ম হয়। এখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অর্থসামাজিক কারণ প্রকাশ পেয়েছে। বহুবিবাহ এবং পুত্র সন্তানের আশা জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক মনে করে যে, পুত্র সন্তান বৃদ্ধি পিতামাতাকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দিতে সক্ষম। অনেকে অধিক নিরাপত্তার আশায় একাধিক পুত্র সন্তান কামনা করেন। আবার অনেকে একাধিক কন্যা সন্তান নিতে থাকেন, একটি পুত্র সন্তানের আশায়। এমনকি কন্যা সন্তান থাকা সত্ত্বেও আবার বিয়ে করেন পুত্র সন্তানের আশায়। সুতরাং কাশেম মিয়ার ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে আর্থসামাজিক নিরাপত্তার চিন্তা ও বহুবিবাহর কারণগুলো নিহিত রয়েছে।

ঘ শামীমা ও ইসলাম সাহেবের কাজগুলো বাংলাদেশের অন্যতম নাগরিক সমস্যা নিরক্ষরতা দূরীকরণে সহায়ক।

নিরক্ষর বলতে সাধারণত সেই ব্যক্তিকে বোঝায়, যার কোনো অক্ষরজ্ঞান নেই, এমনকি যিনি তার নিজের নাম পর্যন্ত লিখতে পারেন না। আমাদের দেশের জনসংখ্যার বেশিরভাগ মানুষ এখনো এই সমস্যায় জর্জরিত। বিশাল এই জনগোষ্ঠীর মাঝে শিক্ষার আলোয় নিয়ে আসবে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে।

উদ্দীপকের শামীমা নিরক্ষরতা দূরীকরণে বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম এবং ইসলাম সাহেবের সংস্থা দরিদ্র ও অসহায়দের শিক্ষা উপকরণ ও বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে পদক্ষেপ নিয়েছেন। আমাদের দেশে কেবলই শিশুদের শিক্ষাদানের মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূরীকরণ সম্ভব নয়। কারণ এ নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশ প্রাপ্তবয়স্ক এবং বৃদ্ধ। তাই বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম নিরক্ষরতা সমস্যার সমাধানের একটি কার্যকরী উপায়। যা উদ্দীপকের শামীমা পালন করেছেন। আবার এদেশে শিক্ষার্থীদের ঝরেপড়া ও এমনকি একেবারেই নিরক্ষর হওয়ার বড় কারণ অর্থনৈতিক অবস্থা। প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহে ব্যর্থ হওয়া ও পরিবারসহ নিজেদের ভরণপোষণের লক্ষ্যে অসংখ্য মানুষ শ্রমজীবীতে পরিণত হয়। এক্ষেত্রে উদ্দীপকের ইসলাম সাহেবের ন্যায় দরিদ্র ও অসহায় পরিবারের সন্তানদের শিক্ষা উপকরণ ও বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ শিক্ষার্থীদের ঝরেপড়া রোধ করবে, যা নিরক্ষরতা সমস্যার কার্যকরী ও উপযুক্ত সমাধান।

সুতরাং এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, শামীমা ও ইসলাম সাহেবের কাজগুলো শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে নিরক্ষরতা নামক নাগরিক সমস্যার সমাধানে সহায়ক হবে।

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক জেনারেল আইয়ুব খান কর্তৃক উদ্ভাবিত উদ্ভট গণতান্ত্রিক ধারণাকে মৌলিক গণতন্ত্র বলে।

খ পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ গঠনের উদ্দেশ্যে লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়।

ব্রিটিশ শাসন আমলে অবিভক্ত ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যেও স্বশাসনের চেতনা জাগ্রত হয়। আর এক্ষেত্রে মুসলিম স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম লীগ। মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতের মুসলমানদেরকে একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে ঘোষণা করেন। যার ফলে পরবর্তীকালে মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে আলাদা-আবাসভূমির চিন্তা জাগ্রত হয়। এ চিন্তাধারার আলোকেই ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক কর্তৃক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। মূলত লাহোর প্রস্তাবে ভারতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দুটি অঞ্চলে দুটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের চিন্তা করা হয়।

গ ছকে '?' চিহ্নিত স্থানে পূর্ব বাংলার মুক্তির সনদ ১৯৬৬ সালের ৬ দফার প্রতিফলন ঘটেছে।

১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লাহোরে সংবাদ সম্মেলনে ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি উত্থাপন করেন। এ দাবির মাধ্যমে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার সংগ্রামের বীজ নিহিত হয়।

উদ্দীপকে স্বাধীনতার পূর্ববর্তী বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাবহুল সালগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে। সে হিসেবে '?' চিহ্নিত স্থানে ৬ দফা অধিক উপযোগী যেটি ১৯৬৬ সালে সংঘটিত হয়। ১৯৬৬ সালে বিরোধী দলের এক কনভেনশনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ছয় দফা পেশ করেন যা ছিল পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষের প্রাণের দাবি। এই ৬ দফা দাবির মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থাপিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনাধিকার তথা স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ৬ দফার গুরুত্ব অপরিসীম। এর প্রত্যেকটি দফাই ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। এ কারণেই ছয় দফাকে গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

ঘ উদ্দীপকের উল্লিখিত সালগুলোর ঘটনা প্রবাহের মাধ্যমেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।– উক্তিটির সাথে আমি একমত।

১৯৪৭ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সৃষ্টি হলেও শুরু থেকেই শোষিত ছিল পাকিস্তানের দ্বারা। তাই শোষিত বাঙালির প্রথম আন্দোলন শুরু হয় ১৯৫২ সালে ভাষাকে কেন্দ্র করে। তারপর একে একে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন সংঘটিত হয়। এখানেও আমাদেরকে নানা বৈষম্যের শিকার হতে হয়। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনী নিরীহ, নিরস্ত্র, ঘুমন্ত বাঙালির ওপর আক্রমণ চালায়। এসময় তারা গণহত্যা চালায়, নারী নির্যাতন করে, লুণ্ঠন করে। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ।

পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির শুরু থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার ওপর বৈষম্যমূলক শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল। এ বৈষম্য শুরু হয়েছিল প্রথমত ভাষার দিক থেকে। ফলে সংঘটিত হয় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন। এরপর ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে। কিন্তু সেখানেও ষড়যন্ত্র করে বাঙালিকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। পরবর্তীতে বৈষম্যের ব্যধি অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, সামরিক সকল ক্ষেত্রে ছড়িয়ে গিয়েছিল। এ কারণে পরবর্তীতে ৬৬-এর ছয় দফা এবং এ অবস্থার নিস্তার না হলে ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান হয়েছিল। ফলে ভীত পশ্চিম পাকিস্তানি সরকার উপায়ন্তর না দেখে ১৯৭০ সালে নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা করতে থাকে এবং নির্বাচনের রায় বানচাল করার ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু তাদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতি ১৯৭১ সালে প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়।

আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পেছনে একক কোনো ঘটনাবলি নয়, বরং বিভিন্ন সময়ে ঘটিত নানা ঘটনাবলির ইতিহাস জড়িত।

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক SAARC এর পূর্ণরূপ হলো– South Asian Association of Regional Cooperation.

খ ব্রিটিশ শাসনমুক্ত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার এবং পারস্পরিক সহযোগিতার উদ্দেশ্যে কমনওয়েলথ গঠিত হয়।

একসময় প্রায় সারাবিশ্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। ভারতীয় উপমহাদেশও সে সময় ব্রিটিশ শাসনের অধীন ছিল। ব্রিটিশরা সে সময় দোর্দাণ্ড প্রতাপে প্রায় সমগ্র পৃথিবীতে রাজত্ব করেছে। কিন্তু পরবর্তীতে শাসিত অঞ্চলগুলোতে জাতীয়তাবাদী চেতনার সৃষ্টি হয় এবং সেসব অঞ্চল বা দেশ একের পর এক স্বাধীন হতে থাকে। তখন ব্রিটেন ও এর শাসন থেকে মুক্ত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সম্পর্কের বন্ধন ধরে রাখার উদ্দেশ্যে কমনওয়েলথ গঠিত হয়।

গ ডায়াফ্রেমটির 'ক' ছকটি বিশ্বের বৃহৎ আন্তর্জাতিক সংগঠন তথা জাতিসংঘের সংস্থা আন্তর্জাতিক আদালতকে নির্দেশ করছে।

আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের আন্তঃবিবাদের মীমাংসা করা হয়। আন্তর্জাতিক আদালত ১৫ জন বিচারক নিয়ে গঠিত। ১৫ জনের মধ্যে ৯ জন বিচারকের উপস্থিতিতে কোরাম হয়। এর বিচারকদের কাজের মেয়াদ ৯ বছর। সাধারণ ও নিরাপত্তা পরিষদ পৃথক অধিবেশনে বসে আদালতের বিচারকদের নির্বাচিত করে। কোনো সদস্য রাষ্ট্র হতে একজনের বেশি বিচারক নেয়া যায় না।

উদ্দীপকে 'ক' ছকটিতে বলা হয়েছে, সংস্থাটির ১৫ জন প্রতিষ্ঠাতা স্থায়ী সদস্য যাদের কোম্পানীর অভ্যন্তরে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা রয়েছে। এরূপ বর্ণনার মাধ্যমে জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা আন্তর্জাতিক আদালতের চিত্র প্রকাশ পায়। জাতিসংঘের যেকোনো সদস্য রাষ্ট্র অন্য কোনো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে বিরোধ মীমাংসার জন্য আন্তর্জাতিক আদালতে বিচার প্রার্থনা করতে পারে। আদালত তার বিচারকার্য দ্বারা বিশ্বশান্তি রক্ষা করে। জাতিসংঘ সনদের অন্তর্ভুক্ত কোনো বিষয় নিয়ে মামলা হলে এবং জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সম্পাদিত কোনো চুক্তি নিয়ে বিরোধ দেখা দিলেও আন্তর্জাতিক আদালত তা মীমাংসা করে। এছাড়া সাধারণ ও নিরাপত্তা পরিষদ কোনো আইনের ব্যাখ্যা চাইলে আন্তর্জাতিক আদালত তার ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে।

ঘ ডায়াফ্রেমটির 'খ' নির্দেশিত সংস্থাটি হলো জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ। সাধারণ পরিষদের সাথে বাংলাদেশের সুসম্পর্ক রয়েছে।

সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘের আইনসভার মতো। জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র সাধারণ পরিষদের সদস্য। সাধারণত বছরে একবার এ পরিষদের অধিবেশন বসে। তবে নিরাপত্ত পরিষদের অনুরোধে বিশেষ অধিবেশন বসতে পারে। প্রত্যেক অধিবেশনের শুরুতে সদস্যদের ভোটে পরিষদের একজন সভাপতি নির্বাচিত হন। সাধারণ পরিষদে প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের একটিমাত্র ভোটদানের অধিকার আছে।

উদ্দীপকে 'খ' নির্দেশিত সংস্থাটি হলো জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ। সাধারণ পরিষদের সাথে বাংলাদেশের সুসম্পর্ক বিদ্যমান। জাতিসংঘে যোগদানের ১ সপ্তাহ পর ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলায় ভাষণ প্রদান করেন। এক বছরের মধ্যে বাংলাদেশ সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয়। ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহিত নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এক শক্তিশালী প্রবক্তা হিসেবে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। বাংলাদেশ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের উদ্যেগে গৃহীত অনেকগুলো আন্তর্জাতিক চুক্তি ও মানবাধিকার সনদের স্বাক্ষরদাতা ও অনুসমর্থনকারী দেশ। বাংলাদেশ ১৯৯৯ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৫৪তম অধিবেশনে সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করে।

সুতরাং আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সাথে বাংলাদেশের সুসম্পর্ক বিদ্যমান। যেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মডেল টেস্ট- ০২

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	K	২	M	৩	M	৪	K	৫	K	৬	N	৭	N	৮	L	৯	K	১০	M	১১	L	১২	K	১৩	M	১৪	L	১৫	M
	১৬	N	১৭	K	১৮	K	১৯	K	২০	N	২১	N	২২	M	২৩	M	২৪	K	২৫	K	২৬	K	২৭	M	২৮	L	২৯	N	৩০	K

সৃজনশীল

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক নাগরিক, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের আচরণ ও কার্যাবলি নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনার মাধ্যমে যে বিষয়টি আদর্শ নাগরিক জীবন সম্বন্ধে জ্ঞানদান করে, তাকে পৌরনীতি বলে।

খ পরিবার তার সদস্যকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নানা বিষয়ে শিক্ষা ও নির্দেশনা প্রদান করে বলে এটিকে চিরন্তন বিদ্যালয় বলা হয়।

আমাদের মধ্যে অনেকে বিদ্যালয়ে যাওয়ার পূর্বেই পরিবারের বর্ণমালার সাথে পরিচিত হই। তাছাড়া মা-বাবা, ভাই-বোন ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের পারস্পরিক সহায়তায় সততা, শিষ্টাচার, উদারতা, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি মানবিক গুণাবলি শিক্ষালাভের প্রথম সুযোগ পরিবারেই সৃষ্টি হয়। এগুলো পরিবারের শিক্ষামূলক কাজ। আর পরিবারে শিশুর এসব প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় বলে পরিবারকে শাশ্বত বিদ্যালয় বা চিরন্তন বিদ্যালয় বলা হয়।

গ রহিম মিয়া ও তার স্ত্রীর কাজটি পরিবারের অর্থনৈতিক কাজ।

পরিবারের সদস্যদের ভরণ-পোষণ অর্থাৎ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি চাহিদা পূরণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্নভাবে অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে এসব চাহিদা পূরণ করে থাকে। পরিবারকে কেন্দ্র করে কুটির শিল্প, মৎস্য চাষ, কৃষিকাজ, পশুপালন ইত্যাদি অর্থনৈতিক কাজ সম্পাদিত হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে নতুন নতুন কাজের সৃষ্টি হয়েছে। আর এভাবেই বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে পরিবারের সকল অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত রহিম মিয়া একজন দরিদ্র কৃষক। পরিবারের সচ্ছলতার জন্য তার স্ত্রী হাঁস-মুরগি পালন করে। বাঁশ ও বেতের ঝুড়ি তৈরি করে। রহিম মিয়া সেগুলো বাজারে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করে যা অর্থনৈতিক আওতাভুক্ত কুটির শিল্প ও পশুপালনের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং বলা যায়, রহিম মিয়া ও তার স্ত্রীর কাজটি পরিবারের অর্থনৈতিক কাজ।

ঘ সাদিয়া ও শর্মিলার পরিবারের মধ্যে আমি সাদিয়ার পরিবারকে আদর্শ পরিবার বলে মনে করি।

পরিবার হলো তার সদস্যদের জন্য প্রশান্তির জায়গা। এখানে একে অন্যের প্রতি সহানুভূতি, ভালোবাসা প্রকাশের মাধ্যমে যেমন সদস্যরা শান্তি লাভ করে তেমনি পরিবার তাকে বেঁচে থাকার মনস্তাত্ত্বিক খোরাক জোগায়।

উদ্দীপকে উল্লিখিত সাদিয়া কর্মজীবনে শতব্যস্ততার মাঝেও যতটুকু সময় পান পরিবারের সবার প্রতি খেয়াল রাখেন এবং তাদের সার্বিকভাবে ভালো রাখার চেষ্টা করেন। তাছাড়া তিনি পরিবারের সদস্যদের বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড যেমন– গল্পগুজব, হাসিঠাট্টা, গান বাজনা ও বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে যাওয়া ইত্যাদি কাজগুলোর মাধ্যমে পরিবারের সকলকে আনন্দদানের মাধ্যমে প্রশান্তি লাভ করে থাকে। অপরদিকে, উদ্দীপকে উল্লিখিত সাদিয়ার বান্ধবী শর্মিলা ব্যক্তিগত জীবনে এতই ব্যস্ত যে পরিবারের কাউকে সময় দিতে পারে না। সে নিজের জীবনকে যান্ত্রিক বলে মনে করে। কিন্তু তিনি একথা উপলব্ধি করে ব্যর্থ হয়েছেন যে, পরিবারের হক বা অধিকার আদায় করা উচিত। শতব্যস্ততার মাঝেও পরিবারকে সজ্ঞা ও সময় দিতে হবে। পরিবারের আনন্দ ও বিনোদনের জন্য তাকে বিভিন্ন বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে হবে। কিন্তু তিনি তা করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

তাই সার্বিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি সাদিয়ার পরিবারকে আদর্শ পরিবার বলে মনে করি। কারণ তার পরিবারটিই পরিবারের আদর্শকে ফুটিয়ে তোলে।

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রে ব্যক্তি যে সম্মান ও মর্যাদা লাভ করে তাকে নাগরিকতা বলে।

খ একজন ব্যক্তির একই সাথে দুটি রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জনকে দ্বৈত নাগরিকতা বলে।

জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের দুটি নীতি থাকায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্বৈত নাগরিকতা সৃষ্টি হতে পারে। যেমন : বাংলাদেশে নাগরিকতা নির্ধারণে জন্মনীতি অনুসরণ করে। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জন্মনীতি ও জন্মস্থান উভয় নীতি অনুসরণ করে। কাজেই বাংলাদেশের বাবা-মায়ের সন্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করলে সেই সন্তান জন্মস্থান নীতি অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করবে। আবার জন্মনীতি অনুযায়ী সে বাংলাদেশের নাগরিকতা অর্জন করবে। এক্ষেত্রে দ্বৈত নাগরিকতা সৃষ্টি হবে।

গ উদ্দীপক-১ এ উল্লিখিত সেলিম সাহেবের ঘটনাটি হলো আইনগত অধিকারের অন্তর্ভুক্ত নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকার।

আইনগত অধিকারের একটি ধরন হচ্ছে রাজনৈতিক অধিকার। রাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের এবং সকল প্রকার অভাব-অভিযোগ আবেদনের মাধ্যমে প্রতিকার পাওয়াকে নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকার বলে। যেমন– ভোটাধিকার, নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অধিকার, নির্বাচিত হয়ে শাসনকার্যে অংশগ্রহণের অধিকার, সরকারি চাকরি লাভের অধিকার, বিদেশে অবস্থানকালে নিরাপত্তা লাভের অধিকার ইত্যাদি। রাজনৈতিক অধিকার ভোগের বিনিময়ে নাগরিকরা রাষ্ট্র পরিচালনায় পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে।

উদ্দীপক-১ এর সেলিম সাহেব সোনাপুর ইউনিয়নের একজন জনপ্রিয় ব্যক্তি। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। এরূপ বর্ণনা নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকারকে নির্দেশ করে। কেননা, ভোটদান, নির্বাচিত হওয়া এবং সকল প্রকার আবেদনের মাধ্যমে প্রতিকার পাওয়াকে রাজনৈতিক অধিকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

ঘ উদ্দীপক-২ এ সেন্টু সাহেবকে সুনাগরিকের আত্মসংযম গুণটি প্রভাবিত করেছে।

আত্মসংযমের অর্থ হলো নিজেকে সকল প্রকার লোভ-লালসার উর্ধ্বে রেখে সততা ও নিষ্ঠার সাথে নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করা। অর্থাৎ, সমাজের বৃহৎ স্বার্থে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করার নাম হলো আত্মসংযম। দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, পক্ষপাতিত্ব, ঘুষ ইত্যাদি থেকে নিজেকে সংযত রাখা হচ্ছে আত্মসংযমের উদাহরণ। আত্মসংযম চর্চায় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জাগ্রত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সেন্টু সাহেব একজন প্রতিষ্ঠিত চাল ব্যবসায়ী। প্রচলিত দামেই তিনি বাজারে চাল বিক্রি করেন। কিন্তু করোনার কারণে সকলের আর্থিক দুরবস্থার কথা চিন্তা করে কেনা দামেই চাল বিক্রি করেন। ক্রান্তিকালীন পণ্যের দাম বাড়ানো ব্যবসায়ীদের সাধারণ নীতি। কিন্তু সে নিজেকে সংযত করেছেন কারণ তিনি নিজ লাভের চেয়ে জনগণের কল্যাণকে বড় করে দেখেছেন। এটিই আত্মসংযম, যা সুনাগরিকের একটি অন্যতম গুণ।

সুতরাং বলা যায়, সেন্টু সাহেবের মধ্যে সুনাগরিকের আত্মসংযম গুণটি বিদ্যমান।

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক রক্ষার জন্য যে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা হয় তাই আন্তর্জাতিক আইন।

খ আইন ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ করে না, কেননা আইন হচ্ছে সর্বজনীন।

সমাজের সকল ব্যক্তি আইনের দৃষ্টিতে সমান। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, নারী-পুরুষ, ধনী, দরিদ্র প্রভৃতি সবার জন্যই আইন সমানভাবে প্রযোজ্য।

গ রহিমা বেগমের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা খর্ব হয়েছে।

যোগ্যতা অনুযায়ী পেশা গ্রহণ এবং উপযুক্ত পারিশ্রমিক লাভ করাকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলা হয়। নাগরিকের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থাকলে তার যোগ্যতা অনুযায়ী উপার্জনের নিশ্চয়তা থাকে। সমাজের অন্য শ্রেণির শোষণ থেকে মুক্ত থাকার জন্য অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রয়োজন। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সমাজের নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্রদের মধ্যে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করা হয় না। সবাই তার যোগ্যতা অনুযায়ী আর্থিক সুবিধা পাবে এটিই অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মূলকথা।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এ রহিমা বেগম একজন নির্মাণ শ্রমিক। তিনি তার পুরুষ সহকর্মীর তুলনায় কম মজুরি পেয়েছেন। ফলে তিনি তার কাজ এবং যোগ্যতা অনুযায়ী উপযুক্ত পারিশ্রমিক হতে বঞ্চিত হয়েছেন। এ জাতীয় ঘটনায় রহিমা বেগমের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা খর্ব হয়েছে। কেননা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতার শর্তমতে একই কাজের জন্য রহিমা বেগমের মজুরি পুরুষ কর্মীর সমান হওয়ার কথা। কিন্তু রহিমা বেগম নারী বলে তাকে কম মজুরি দেওয়া হয়েছে। এটি অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পরিপন্থি। তাই বলা যায়, রহিমা বেগমের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা খর্ব হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের শামীমা সামাজিক স্বাধীনতা থেকে এবং আব্দুর রহিম রাজনৈতিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

সমাজের মানুষ ব্যক্তিগতভাবে আইন অনুমোদিত যে স্বাধীনতা ভোগ করে তাই সামাজিক স্বাধীনতা। জীবন রক্ষা, সম্পত্তি ভোগ, বৈধ পেশা গ্রহণ প্রভৃতি সামাজিক স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত। সামাজিক স্বাধীনতা ভোগের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির নাগরিক জীবন বিকশিত হয়। সমাজে বসবাসকারী মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য সামাজিক স্বাধীনতা প্রয়োজন।

উদ্দীপকের শামীমা একটি গার্মেন্টসে চাকরি করেন। সেখানে বেতন কম হওয়ায় তিনি বেশি বেতনে নতুন একটি গার্মেন্টসে যোগ দিতে চাইলে আগের কারখানার মালিক তাকে যোগ দিতে বাধা দেয়। এ কারণে শামীমার নতুন কর্মক্ষেত্রে যোগদান করতে না পারার বিষয়টি তার সামাজিক স্বাধীনতাকে খর্ব করে। কেননা ব্যক্তির ইচ্ছামাফিক যেকোনো বৈধ পেশা গ্রহণ করার অধিকার সামাজিক স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত। আবার নাগরিকের রাজনৈতিক স্বাধীনতার মধ্যে একটি হলো বিদেশে অবস্থানকালীন নিরাপত্তা লাভ করা। এই স্বাধীনতা বলে একজন নাগরিক বিদেশ অবস্থানকালে বিপদে পড়লে তার নিজ রাষ্ট্রের কাছ থেকে সাহায্য-সহযোগিতা লাভ করবে। কিন্তু উদ্দীপকের আব্দুর রহিম মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশে চাকরি নিয়ে বিপদে পড়লেও নিজ দেশের কাছ থেকে সে কোনো সহায়তা পায়নি। তাই আব্দুর রহিম বিদেশে অবস্থানকালে নিজ দেশের দূতাবাসের মাধ্যমে চাকরি সংক্রান্ত অভিযোগের কোনো প্রতিকার না পাওয়ার ঘটনাটি তার রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে খর্ব করে।

সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, উদ্দীপকের শামীমা সামাজিক স্বাধীনতা থেকে এবং আব্দুর রহিম রাজনৈতিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সরকারের সমস্ত কার্যাবলি একটিমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় তাকে এককেন্দ্রিক সরকার বলে।

খ একই সাথে কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক সরকারের উপস্থিতি বিদ্যমান থাকায় যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে দ্বৈত সরকারব্যবস্থা বলা হয়।

যুক্তরাষ্ট্র বলতে সেই ধরনের সরকারকে বোঝায়, যেখানে একাধিক অঞ্চল বা প্রদেশ মিলে একটি সরকার গঠন করে। এ ধরনের সরকার ক্ষমতা বণ্টনের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এতে সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার কিছু অংশ প্রদেশ বা আঞ্চলিক সরকারের এবং জাতীয় বিষয়গুলো কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে। ফলে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় উভয় সরকারই মৌলিক ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র থেকে দেশ পরিচালনা করে। অর্থাৎ এতে দ্বৈত সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান থাকে। তাই যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে দ্বৈত সরকারব্যবস্থা বলা হয়।

গ তথ্য ছক-২ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থাকে নির্দেশ করে।

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বলতে সেই সরকারকে বোঝায় যেখানে শাসন বিভাগ তার কাজের জন্য আইন বিভাগের নিকট দায়ী থাকে না। রাষ্ট্রপতি তার পছন্দের ব্যক্তিদের দিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিসভার সদস্যগণ আইনসভার সদস্য নন। মন্ত্রিসভার সদস্যগণ তাদের কাজের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে দায়ী থাকেন। রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টির উপর মন্ত্রীদের কার্যকাল নির্ভর করে। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে রাষ্ট্রপতি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনিই প্রকৃত শাসক ও সরকারপ্রধান। তিনি কোনো কাজে মন্ত্রিদের পরামর্শ ব্যবহার করতে পারেন, আবার নাও পারেন।

উদ্দীপকের ছক-২ এর রাষ্ট্রব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য লক্ষ করলে দেখা যায়, রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান প্রকৃত শাসক ও সরকারপ্রধান। যেখানে ক্ষমতার পৃথকীকরণ করা হয় এবং এ রাষ্ট্রে কোনো সিদ্ধান্ত দ্রুত নেয়া সম্ভব। এসব বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থাকে উপস্থাপন করে। কারণ এই রাষ্ট্রপতি হলেন প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। আবার সরকারে তিনটি বিভাগ পৃথকভাবে কাজ করে এবং একই সাথে একটি অন্যটির সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে। এছাড়া এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি দলের চেয়ে জাতীয় স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করাকে অধিকতর গুরুত্ব দেন।

ঘ ছক-১ এ সংসদীয় এবং ছক-২ এ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান। এর মধ্যে বাংলাদেশের জন্য সংসদীয় সরকারব্যবস্থা উপযোগী বলে আমি মনে করি।

আইন ও শাসন বিভাগের সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে সৃষ্টি দুটি সরকারব্যবস্থা হলো সংসদীয় সরকার ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার। বাংলাদেশে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান। বাংলাদেশের জন্য এ সরকারব্যবস্থা খুবই উত্তম। কেননা এ ধরনের সরকারে জনমতের পূর্ণ প্রতিফলন দেখা যায় এবং সরকার যথাসময়ে জনকল্যাণে কাজ করতে পারে।

ছক-১ এ সংসদীয় সরকারব্যবস্থা এবং ছক-২ এ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। এই দুই সরকারব্যবস্থার মধ্যে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা বাংলাদেশের জন্য উপযোগী। কেননা, এ সরকারব্যবস্থার বেশ কিছু গুণ আছে যা বাংলাদেশের জন্য খুবই উপযোগী। বাংলাদেশের জনগণ সহজ-সরল হলেও রাজনৈতিকভাবে সচেতন। ছোট্ট দেশটির রাজনীতিতে তাই জনগণের মতামত ব্যাপক প্রভাব ফেলে। যেটি তারা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রায় প্রদানের মাধ্যমে সহজেই সরকার পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে। আর সংসদীয় সরকার একটি দায়িত্বশীল সরকারব্যবস্থা। এতে ক্ষমতাসীন ও বিরোধীদল উভয়ই তাদের কাজের জন্য জনগণের নিকট দায়ী থাকে। এ সরকারব্যবস্থায় বিরোধী দল হলো বিকল্প সরকারের মতো। জাতীয় সংকটে ক্ষমতাসীন ও বিরোধীদল আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করার চেষ্টা করে। এছাড়া তারা সরকারের সমালোচনা করার সুযোগ পায়। ফলে সরকার জনরোষের ভয়ে জনবিরোধী কাজ থেকে বিরত থাকে।

আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের মতো জনবহুল ছোট্ট একটি দেশে সংসদীয় সরকার দেশের উন্নয়নে ও জনকল্যাণে অধিক ভূমিকা রাখতে পারে। জনগণ সরাসরি রাজনীতিতে এবং সরকার পরিচালনা অংশ নিতে পারে বলে বিপ্লবের সম্ভাবনা থাকে না। সরকারও জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে সমস্ত কাজ করে। এসব কারণে বাংলাদেশের জন্য সংসদীয় সরকার বেশ উপযোগী।

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের সংবিধান ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ সালে কার্যকর হয়।

খ দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান বলতে সেই সংবিধানকে বোঝায় যে সংবিধানের ধারা সহজে পরিবর্তন বা সংশোধন করা যায় না।

সংশোধনের ভিত্তিতে সংবিধান দুই প্রকার। এর একটি সুপরিবর্তনীয় ও অন্যটি দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান। দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান পরিবর্তন করতে হলে জটিল পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়। প্রয়োজন হয় বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা, সম্মেলন কিংবা ভোটাভুটির। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের অন্যতম উদাহরণ।

গ উদ্দীপকের জনাব আমিনুলের সংবিধান সম্পর্কিত আলোচনায় সংবিধানের বেশকিছু ইতিবাচক দিক তথা উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

সংবিধান হলো রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক দলিল। সরকার কীভাবে নির্বাচিত হবে, আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ কীভাবে গঠিত হবে, এদের ক্ষমতা কী হবে, জনগণ ও সরকারের সম্পর্ক কেমন হবে এসব বিষয় সংবিধানে উল্লেখ থাকে। অর্থাৎ সংবিধান হলো একটি রাষ্ট্রের দর্পণস্বরূপ।

উদ্দীপকের জনাব আমিনুল বলেছেন, বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের ন্যায় আমাদের সংবিধান লিখিত। আর সংবিধানের একটি ইতিবাচক দিক হলো লিখিত হওয়া। লিখিত সংবিধান সাধারণত সুস্পষ্ট হয় যা সংবিধানের অন্যতম ইতিবাচক দিক। আবার লিখিত সংবিধানে সবকিছু লিখিত থাকে বলে শাসক তার ইচ্ছামতো যখন তখন পরিবর্তন করতে পারে না। ফলে সংবিধান স্থিতিশীল হয়, যা জনগণের জন্য কল্যাণকর। লিখিত সংবিধানের আরেকটি ইতিবাচক দিক হলো এটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থার জন্য উপযোগী। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সফলতার পূর্বশর্ত হলো লিখিত সংবিধান। এভাবেই জনাব আমিনুলের আলোচনায় সংবিধানের ইতিবাচক দিকগুলো ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকের আমিনুলের আলোচনায় লিখিত ও অলিখিত সংবিধানের প্রসঙ্গ প্রকাশ পেয়েছে। এ দুটি সংবিধানের মধ্যে আমি লিখিত সংবিধানকে উত্তম মনে করি।

যে সংবিধানের অধিকাংশ বিষয় দলিলে লিখিত থাকে তাকে লিখিত সংবিধান বলে। অন্যদিকে যে সংবিধানের অধিকাংশ নিয়ম কোনো দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে না তাকে অলিখিত সংবিধান বলে। এ ধরনের সংবিধান প্রথা ও রীতিনীতি ভিত্তিক। চিরাচরিত নিয়ম ও আচার অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। কিন্তু লিখিত সংবিধান আধুনিক ও সুস্পষ্ট লিখিত আকারে প্রকাশ থাকে যা সবার বোধগম্য হয়।

উদ্দীপকে জনাব আমিনুল লিখিত ও অলিখিত সংবিধানকে আলোকপাত করেছেন। এর মধ্যে লিখিত সংবিধান সবদিক থেকে উত্তম মনে হয়। কারণ লিখিত সংবিধানের অধিকাংশ ধারা লিখিত থাকে বলে এটি জনগণের নিকট সুস্পষ্ট ও বোধগম্য হয়। তাই এ ধরনের সংবিধানে কোনো সন্দেহ ও দ্বিধার অবকাশ থাকে না। লিখিত সংবিধান স্থিতিশীল বিধায় শাসক তার ইচ্ছামতো এটি পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারে না। তাই যেকোনো পরিস্থিতিতে লিখিত সংবিধান স্থিতিশীল থাকে এবং শাসক ও জনগণ এটি মেনে চলতে বাধ্য হয়। লিখিত সংবিধানে জনগণের মৌলিক অধিকারগুলো লিপিবদ্ধ থাকে। ফলে কেউ কারও অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে সাহস পায় না। লিখিত সংবিধানে শাসকের ক্ষমতা কী হবে, জনগণ কী কী অধিকার ভোগ করবে তা উল্লেখ থাকে। এর ফলে শাসক ও জনগণ নিজেদের ক্ষমতা ও অধিকার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে।

অতএব উল্লিখিত এসব কারণ বিবেচনা করেই লিখিত সংবিধানকে আমি উত্তম বলে মনে করি।

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে রাষ্ট্র জনসাধারণের প্রাত্যহিক ন্যূনতম চাহিদা পূরণের জন্য জনকল্যাণমূলক কাজ করে, তাকেই কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলে।

খ একনায়কতন্ত্রে একজন স্বৈরশাসকের হাতে সব ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে বলে একে স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা বলা হয়।

একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা জনগণের হাতে না থেকে একজন স্বেচ্ছাচারী শাসক বা দল বা শ্রেণির হাতে ন্যস্ত থাকে। এতে নেতাই দলের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। একনায়কতান্ত্রিক শাসককে সহায়তা করার জন্য মন্ত্রী বা উপদেষ্টা পরিষদ থাকে। তারা শাসকের আদেশ ও নির্দেশ মেনে চলে। একনায়কের আদেশই আইন। এসব কারণে একনায়কতন্ত্রকে স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা বলা হয়।

গ দৃশ্য-১ এর 'ক' রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান।

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বলতে সেই সরকারকে বোঝায় যেখানে শাসন বিভাগ তার কাজের জন্য আইন বিভাগের নিকট দায়ী থাকে না। রাষ্ট্রপতি তার পছন্দের ব্যক্তিদের দিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিসভার সদস্যগণ আইনসভার সদস্য নন। মন্ত্রিসভার সদস্যগণ তাদের কাজের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে দায়ী থাকেন। রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টির উপর মন্ত্রীদের কার্যকাল নির্ভর করে। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে রাষ্ট্রপতি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনিই প্রকৃত শাসক ও সরকারপ্রধান। তিনি কোনো কাজে মন্ত্রিদের পরামর্শ ব্যবহার করতে পারেন, আবার নাও পারেন।

উদ্দীপকের দৃশ্য-১ এ জনগণের ভোটে নির্বাচিত 'X' ব্যক্তি 'ক' রাষ্ট্রের প্রকৃত শাসক। তিনি আইনসভার সদস্য নন। তার সরকার ব্যবস্থায় দলের চাইতে জাতীয় স্বার্থ বেশি গুরুত্ব পায়। এরূপ বর্ণনা থেকে সহজেই রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কেননা এই সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি হলেন প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। আবার সরকারের তিনটি বিভাগ পৃথকভাবে কাজ করে এবং একই সাথে একটি অন্যটির সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে। এছাড়া এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি দলের চেয়ে জাতীয় স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করাকে অধিকতর গুরুত্ব দেন।

ঘ জনাব হুমায়ুন কবীর হলেন একজন জেলা প্রশাসক। জেলা প্রশাসক স্থানীয় প্রশাসনের উন্নয়নের রূপকার।– উক্তিটি যথার্থ।

জেলা প্রশাসন মাঠ বা স্থানীয় প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হলেন জেলা প্রশাসক। দেশের সব জেলায় একজন করে জেলা প্রশাসক আছে। তিনি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের একজন অভিজ্ঞ সদস্য। তাকে কেন্দ্র করে জেলার সকল সরকারি কাজ পরিচালিত হয়।

উদ্দীপকের জনাব হুমায়ুন কবীর একটি জেলার প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা। তিনি প্রশাসনের একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি। জেলার সার্বিক উন্নতি, অগ্রগতি সংক্রান্ত কাজ তার নির্দেশে পরিচালিত হয়। জনাব হুমায়ুন কবীরের এরূপ কাজের মাধ্যমে জেলা প্রশাসকের প্রতিরূপ প্রকাশ পেয়েছে। তার কাজের ব্যাপকতার জন্য তিনি জেলার মূল স্তম্ভ। কারণ কেন্দ্র থেকে আসা সকল আদেশ নির্দেশ ও সিদ্ধান্ত তিনি বাস্তবায়ন করেন। জেলার বিভিন্ন অফিসের কাজ তদারক ও সমন্বয় করেন। জেলার বিভিন্ন শূন্যপদে লোক নিয়োগ করেন। আবার তিনি জেলা কোষাগারের রক্ষক ও পরিচালক। জেলার সবধরনের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব তার। সে কারণে তিনি কালেক্টর নামে পরিচিত। এছাড়াও শাসক হিসেবে তিনি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজ তত্ত্বাবধান করেন। আবার জেলার সেবক হিসেবে তিনি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাসংক্রান্ত এবং উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকেন। জেলার মধ্যে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা ও জনগণের জীবনের নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত। তিনি পুলিশ প্রশাসকের সাহায্যে এ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। আবার তিনি জেলার সার্বিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ (শিল্প, কৃষি, যোগাযোগসহ ইত্যাদি) বাস্তবায়নের দায়িত্বও তার। তিনি জেলার প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও করেন।

উপরের আলোচনা থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, জেলা প্রশাসক হলো জেলার প্রতিচ্ছবি। তার কাজের ব্যাপকতার জন্যই তাকে জেলার মূলস্তম্ভ বলা হয়ে থাকে।

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাজনৈতিক দল বলতে বোঝায় একটি জনগোষ্ঠীর সেই অংশকে যারা একটি আদর্শ বা কিছু নীতি বা কর্মসূচির ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় সমস্যা সমাধানে সংগঠিত হয়।

খ মধ্যবর্তী সংস্থা কর্তৃক প্রতিনিধি নির্বাচন করাকে বলা হয় পরোক্ষ নির্বাচন।

জনগণ ভোটের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি বা একটি মধ্যবর্তী সংস্থা নির্বাচিত করেন। এ জনপ্রতিনিধিগণ ভোট দিয়ে যখন রাষ্ট্রপতি বা সংসদের সংরক্ষিত আসনের সদস্য নির্বাচন করেন, তাকে বলা হয় পরোক্ষ নির্বাচন। পরোক্ষ নির্বাচন বলতে যে নির্বাচন ব্যবস্থাকে বোঝায় সেখানে সাধারণ ভোটারগণ ভোট দিয়ে মধ্যবর্তী নির্বাচনি সংস্থা তৈরি করে। আর এই নির্বাচনি সংস্থা চূড়ান্তভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করে। যেমন– বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন।

গ উদ্দীপকে শুভর ভোট দেওয়ার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রতিনিধি বাছাইয়ের একমাত্র প্রক্রিয়া হলো নির্বাচন। এই নির্বাচন ব্যবস্থা আবার দুটি পদ্ধতিতে বিভক্ত। একটি প্রত্যক্ষ ও অন্যটি পরোক্ষ। যে পদ্ধতিতে ভোটার গোপনে ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচিত করে তাকে বলা হয় প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি।

উদ্দীপকের একটি জাতীয় নির্বাচনে শুভ প্রথমবারের মতো সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পেরেছে। একমাত্র প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে একজন ভোটার তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে। প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে সরাসরি নেতা নির্বাচন করা হয়। সুতরাং বলা যায়, শুভর ভোট দেওয়ার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকের উল্লিখিত শুভর বাবার বর্ণনাকৃত প্রতিষ্ঠানের সাথে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের সাদৃশ্য রয়েছে। সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে এ প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অত্যধিক।

নির্বাচন কমিশন হলো একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অনধিক চার জন কমিশনার নিয়ে এ নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি নিয়ে সংসদ প্রতিষ্ঠার জন্য নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা খুবই জরুরি। একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের প্রধান শর্ত। যা গণতন্ত্রকে সুসংহত করে তোলে।

শুভর দাদা বলেন, সাংবিধানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে ভূমিকা পালন করে। তার এরূপ বর্ণনায় বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের কাজের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। একটি সুষ্ঠু ও বস্তুনিষ্ঠ নির্বাচন অনুষ্ঠানে এ নির্বাচন কমিশনের কোনো বিকল্প নেই। কারণ নির্বাচন। কমিশনের দায়িত্ব হলো নির্বাচনকে একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনার মধ্যে এনে নির্বাচনের পরিবেশকে স্থিতিশীল রাখা। তারা নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ করে ও নির্বাচনের একটি রূপরেখা তৈরি করে। ফলে নির্বাচনের দিনে জনগণ সুষ্ঠুভাবে ভোট দেওয়ার সুযোগ পায়।

আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, উদ্দীপকের উল্লিখিত শুভর দাদার বর্ণনাকৃত প্রতিষ্ঠানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ সংগঠন তথা নির্বাচন কমিশনের প্রধান দায়িত্ব হলো একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান পরিচালনা করা। আর তাই এটি বলার অবকাশ থাকে না যে, একটি সুষ্ঠু ও বস্তুনিষ্ঠ নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনের বিকল্প নেই।

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক উপজেলা পরিষদ কর্তৃক ধার্যকৃত কর, টোল, ফি এবং সরকার ও অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ বা অনুদান ইত্যাদি উপজেলা পরিষদের আয়ের উৎস।

খ উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা আলাদা হওয়ায় তাদের স্থানীয় সরকারব্যবস্থাও ভিন্ন।

ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও জীবনযাপন পদ্ধতি সমতলবাসী বাঙালিদের চেয়ে প্রায় সম্পূর্ণ আলাদা। তাই সমতল ও পাহাড়ি অঞ্চলে একইরূপ স্থানীয় সরকারব্যবস্থা সমানভাবে কার্যকরী হয় না। এ কারণেই পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিশেষ স্থানীয় সরকারব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। ফলে উক্ত স্থানীয় সরকারব্যবস্থা পৃথকভাবে গড়ে ওঠে।

গ উদ্দীপকের জনাব মাইনউদ্দীন-এর ঘটনাটি বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারব্যবস্থার আওতায় পড়েছে।

নাগরিকতার বিকাশে স্থানীয় সরকারব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সকল শ্রেণির মানুষ তাদের নানা প্রয়োজনে স্থানীয় সরকার দপ্তরের দ্বারস্থ হয়। যেমন– শিক্ষার্থীদের পিতার আয়ের সনদপত্র সত্যায়িতকরণের এবং জন্মনিবন্ধনের সার্টিফিকেট সংশ্লিষ্ট সেবা ইউনিয়ন পরিষদ দিয়ে থাকে। এভাবে ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা তথা স্থানীয় সরকার নাগরিকদের নির্দিষ্ট সেবা প্রদান করে যা নাগরিক সনদ নামেও পরিচিত। তৃণমূল পর্যায়ে স্থানীয় ভিত্তিতে এভাবে সরকারের স্থানীয় সরকার বিভাগ কাজ করে থাকে। তাই উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এর জনাব মাইনুদ্দীন তার ছেলের ভর্তি সংশ্লিষ্ট কাজে যে নাগরিক সনদের প্রয়োজনীয়তার মুখোমুখী হয়েছেন তা সরকারের স্থানীয় সরকারব্যবস্থার আওতায় পড়েছে।

ঘ জনাব আতিক উল্লাহ ও জনাব রহমান যথাক্রমে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার প্রতিনিধি। সুতরাং স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে উভয়ের কাজের প্রকৃতি প্রায় অভিন্ন। সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ দুটি ইউনিট। সিটি কর্পোরেশন দেশের বৃহত্তম শহরগুলোতে এবং পৌরসভা অপেক্ষাকৃত ছোট শহরগুলোতে স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধিত্ব করে। এদিক দিয়ে উভয়ের কাজের প্রকৃতি ও পরিধিতে মিল পাওয়া যায়।

উদ্দীপকের জনাব আতিক উল্লাহ যে অফিসে কাজ করেন, সারাদেশে তার মাত্র ১১টি শাখা রয়েছে। আবার এ শাখাসমূহও কেবলই প্রধান প্রধান শহরে অবস্থিত। সুতরাং, তার অফিসটি হচ্ছে সিটি কর্পোরেশনের অফিস। অন্যদিকে, জনাব রহমান যে অফিসে চাকরি করেন সারাদেশে তার ৩১৪টি শাখা রয়েছে। সুতরাং তার অফিসটি হচ্ছে পৌরসভা। সিটি কর্পোরেশন মহানগর এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, বিভিন্ন সমস্যার সমাধান এবং উন্নয়নের জন্য কাজ করে থাকে। অন্যদিকে পৌর এলাকায় স্থানীয় বহুবিধ সমস্যার সমাধান এবং উন্নয়নমূলক কাজের দায়িত্ব পালন করে পৌরসভা। পৌরসভা যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণে কাজ করে। সিটি কর্পোরেশনও তদ্রুপ সিটি এলাকায় সমজাতীয় কাজ আরও বিস্তৃত পরিসরে পরিচালনা করে। সুপরিকল্পিত শহর গড়ার উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা উভয় সংস্থারই মূল লক্ষ্য। বিভিন্ন সামাজিক অনাচার ও অপকর্ম রুখতে উভয় কর্তৃপক্ষই সর্বদা সচেষ্ট থাকে। একইভাবে উভয় কর্তৃপক্ষ রাস্তাঘাটসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সম্পদের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। তবে এ দুটি সংস্থার কাজের মূল পার্থক্য হলো পরিধি ও পরিসরে। অর্থাৎ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের কাজের রূপ, প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য একই কিন্তু পৌরসভায় হয় তা ক্ষুদ্র পরিসরে আর সিটি কর্পোরেশনে বৃহদায়তন এলাকায় বিস্তৃত পরিসরে।

উপরিউক্ত আলোচনায় এ মতামতই ব্যক্ত হয় যে, জনাব আতিক উল্ল্যাহ ও জনাব রহমানের অফিসের কাজের প্রকৃতি একই।

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব কাজ বা আচরণ নারীর বিরুদ্ধে সংঘটিত হয় এবং যা নারীর শারীরিক ও মানসিক ক্ষতিসাধন করে সেসব আচরণকে নারী নির্যাতন বলে।

খ সন্ত্রাসের কারণসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য একটি অন্যতম সাধারণ কারণ।

কোনো সমাজে সম্পদের অসম বণ্টনের ফলে চরম শ্রেণিবৈষম্য সৃষ্টি হয় যা বঞ্চিতদের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি করে। ফলে নিম্ন আয়ের পরিবারে ক্ষুধা নিবৃত্তি, দারিদ্র্য ও বেকারত্ব কাটিয়ে ওঠার জন্য কেউ কেউ অল্প সময়ে বেশি অর্থ উপার্জনের জন্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়। এভাবে অর্থনৈতিক বৈষম্য অনৈতিক সন্ত্রাসী কার্যক্রমের প্রত্যক্ষ ও সাধারণ কারণ হিসেবে প্রতীয়মান হয়।

গ আকবর মিয়ার পরিবারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিভিন্ন কারণ বিদ্যমান।

আমাদের দেশে জনসংখ্যা নানা কারণে বৃদ্ধি পায়। সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি বিভিন্ন উপাদান জনসংখ্যা বৃদ্ধির পেছনে নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। নিরক্ষরতা, দরিদ্রতা, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি হলো জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচিত।

উদ্দীপকের আকবর মিয়া নিরক্ষর। শিক্ষার অভাবে তিনি অজ্ঞতাবশত সন্তানাদির মৌলিক চাহিদা পূরণের সামর্থ্যের বিবেচনা ছাড়াই অধিক সন্তান জন্ম দিয়েছেন। এছাড়া তিনি অল্প বয়সে বিয়ে করেছেন যা জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ বাল্যবিবাহকে নির্দেশ করে। তিনি চারটি মেয়ে সন্তান জন্ম দেবার পর পুত্র সন্তানের আশায় আরেকটি বিয়ে করেন। এর মাধ্যমে তিনি বহুবিবাহ ও পুত্র সন্তান প্রত্যাশা তথা আর্থসামাজিক নিরাপত্তার তথাকথিত ধ্যান ধারণার বহিঃপ্রকাশ করেছেন। আমাদের দেশে বহুবিবাহ দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি কারণ। অপরদিকে, অধিক নিরাপত্তার আশায় পুত্র সন্তান কামনায় আকবর মিয়ার মতো অনেকে বারবার সন্তান জন্ম দিতে থাকে যা দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটায়। এভাবে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ, শিক্ষার অভাব, পুত্র সন্তান কামনা প্রভৃতি আকবর মিয়ার পরিবারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হিসেবে কাজ করছে।

ঘ উদ্দীপকের বরকত আলীর কর্মকাণ্ডের ফলে পরিবেশগত যে দুর্যোগ দেখা দিচ্ছে তা থেকে পরিত্রাণের জন্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি নাগরিক সচেতনতা প্রয়োজন। পরিবেশের সাথে আমাদের সুস্থতা অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। কিন্তু নানা কারণে পরিবেশ আজ দূষণের শিকার হচ্ছে। এ থেকে পরিত্রাণের উপায় খোঁজা তাই জরুরি হয়ে পড়েছে। কারণ পরিবেশগত বিপর্যয় ঠেকাতে না পারলে মানবসভ্যতা বিলিন হয়ে যাবে।

উদ্দীপকের মতো যেসব কাজের দ্বারা পরিবেশ দূষিত হচ্ছে ও যা বিপর্যয় ডেকে আনছে, তার প্রশমনই পরিবেশগত দুর্যোগ থেকে পরিত্রাণের অন্যতম উপায়। এ লক্ষ্যে অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা কলকারখানা বন্ধ ঘোষণা ও নিষেধাজ্ঞা জারি করতে হবে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বেশি ক্ষতিকারক শিল্প কারখানা চিহ্নিত করে বিকল্প ব্যবস্থা নিতে হবে। আবাসিক এলাকায় শিল্পকারখানা স্থাপন রোধ করে বিভিন্ন শিল্প এলাকায় কারখানা স্থাপন করতে হবে। প্লাস্টিক, পলিথিন ব্যাগ, ক্ষতিকারক রাসায়নিক সার, বিষ প্রভৃতির ব্যবহার বন্ধ করে সর্বোত্তম পরিবেশবান্ধব বিকল্প দ্রব্য ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে হবে। ব্যাপক হারে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি ও বৃক্ষরোপণ প্রকৃতিকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে সাহায্য করবে। তাই বনায়ন বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ করতে সকলকে উৎসাহিত করতে হবে। এছাড়া পাহাড় কাটা বন্ধ করে, স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে এবং কাঠ ও গাছের বিকল্প ব্যবহারের মাধ্যমেও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করা যায়।

সর্বোপরি, মানুষের সদিচ্ছা ও সর্বজনীন প্রচেষ্টার মাধ্যমে পরিবেশগত দুর্যোগ বা বিপর্যয় থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব হবে।

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রীয় কাজে সব ধরনের অসহযোগিতা করার জন্য যে আন্দোলন তাই অসহযোগ আন্দোলন নামে পরিচিত।

খ ১৯৬৯ সালে সরকারের বিভিন্ন অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী যে দুর্বার আন্দোলন গড়ে ওঠে, তাই ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান নামে পরিচিত।

মৌলিক গণতন্ত্র, আগরতলা মামলা ও আইয়ুব খানের নির্যাতনের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের উভয় অংশে ১৯৬৯ সালে এক দুর্বার গণ-আন্দোলন শুরু হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বাতিল এবং পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সকল বিরোধী দল ঐক্যবদ্ধ হয়। এ সময় পশ্চিম পাকিস্তানে পুলিশের গুলিতে কয়েকজন ছাত্র নিহত হয়। এ হত্যার প্রতিবাদে সারা দেশে শুরু হয় গণআন্দোলন। শুরু হয় দেশব্যাপী তীব্র ছাত্র-আন্দোলন। এ গণআন্দোলনই ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান নামে পরিচিত।

গ যা, উদ্দীপকের উক্ত নির্বাচনের সাথে আমার পঠিত স্বাধীনতাপূর্ব ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের সাদৃশ্য রয়েছে।

১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট পদ থেকে ইস্তফা দেন। ইয়াহিয়া খান উক্ত পদে আসীন হন। তিনি মার্চের ২৮ তারিখে এক ঘোষণায় পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। অবশেষে ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর সর্বপ্রথম এক ব্যক্তির এক ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্রের স্বাধীনতার দুইযুগ পরে দেশে প্রথমবারের মতো সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নির্বাচনে দেশটির একটি রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও ক্ষমতা হস্তান্তরে শাসকগোষ্ঠী নানা রকম টালবাহানা ও ষড়যন্ত্র করতে থাকে। দেশটির এ নির্বাচনের সাথে ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের সাদৃশ্য রয়েছে। দীর্ঘসময়ের গণআন্দোলনের মুখে পাকিস্তান সরকার এ নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়। উদ্দীপকে যেমন জনপ্রিয় একটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরে নানা রকম টালবাহানা করতে থাকে। ঠিক তেমনি পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনেও তুমুল জনপ্রিয় দল আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরে নানা টালবাহানা ও ষড়যন্ত্র শুরু করে। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকে উক্ত নির্বাচনের সাথে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের বর্ণিত ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন স্বাধীনতার আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করে।– মন্তব্যটি যথার্থ।

দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের পর পাকিস্তান সরকার ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়। এ নির্বাচনই ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রথম সাধারণ নির্বাচন। প্রাপ্তবয়স্ক এবং ধর্মনির্বিশেষে সকলের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্দীপকের 'ক' দেশে প্রথমবারের মতো সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে তুমুল জনপ্রিয় একটি রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও ক্ষমতা হস্তান্তরে শাসকগোষ্ঠী নানা টালবাহানা ও ষড়যন্ত্র শুরু করে। উদ্দীপকের এ নির্বাচনের সাথে তৎকালীন পাকিস্তানের ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের সাদৃশ্য রয়েছে। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত জাতীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ফলে ৬ দফা ও ১১ দফার প্রতি জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থনের বিষয়টি

স্পষ্ট হয়ে যায়। বাঙালি জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক বিজয় ঘটে। অন্যদিকে, পাকিস্তানের সরকার ও স্বার্থান্বেষী মহলের জন্য এটা ছিল বিরাট পরাজয়। তারা বাঙালির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিরোধিতা এবং ষড়যন্ত্র আঁটতে থাকে। পূর্ব বাংলার জনগণ পশ্চিম পাকিস্তানের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে অবস্থান গ্রহণ করে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পেছনে ১৯৭০ সালের সাধারণ পরিষদ নির্বাচনের অপরিসীম গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ নির্বাচন বাঙালি জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক অগ্রযাত্রাকে মুক্তিযুদ্ধের রূপদানে বিশাল ভূমিকা রাখে। পরিণতিতে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। সুতরাং এটা স্পষ্ট হয় যে, স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম।

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ওআইসিকে বাংলায় বলে ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা।

খ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা পরবর্তী বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশায় ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘের সৃষ্টি হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯২০ সালে গঠিত হয়েছিল জাতিপুঞ্জ বা লিগ অব নেশনস। কিন্তু বিভিন্ন স্বার্থের সংঘাতের কারণে এ সংস্থাটি স্থায়িত্ব লাভ করেনি। ফলে ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীকে গ্রাস করে। এ যুদ্ধে বিভিন্ন দেশের ব্যাপক ক্ষতি হয়। আণবিক বোমার আঘাতে জাপানের দুটি শহর (হিরোশিমা ও নাগাসাকি) সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা দেখে বিশ্ববাসী শংকিত ও হতবাক হয়ে যায়। তাদের মনে বিভিন্ন দেশের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা দানা বাঁধে। সৃষ্টি হয় জাতিসংঘের।

গ সংস্থা 'ক' হলো জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ।

সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘের আইনসভার মতো। বিশ্বশান্তি ও সহযোগিতা রক্ষায় এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ পরিষদ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তাসহ। মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করে। এছাড়া জাতিসংঘের মহাসচিব নিয়োগ, নতুন সদস্য গ্রহণ, বাজেট পাস, সদস্য রাষ্ট্রে চাঁদার পরিমাণ নির্ধারণ, বিভিন্ন সংস্থার সদস্য নির্বাচন, নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজ এ পরিষদ সম্পাদন করে থাকে।

উদ্দীপকের সংস্থা 'ক' সম্পর্কে বলা হয়েছে, এটি অন্যান্য শাখা সংস্থায় জনবল নিয়োগ, অধিবেশন আহ্বান, চাঁদা আদায়, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন তৈরি প্রভৃতি প্রশাসনিক কাজ সম্পাদন করে। উদ্দীপকের এরূপ বর্ণনা থেকে সহজেই জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদকে চিহ্নিত করা যায়। সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘের আইনসভার মতো। জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র সাধারণ পরিষদের সদস্য। সাধারণত বছরে একবার এ পরিষদের অধিবেশন বসে। তবে নিরাপত্তা পরিষদের অনুরোধে বিশেষ অধিবেশন বসতে পারে। প্রত্যেক অধিবেশনের শুরুতে সদস্যদের ভোটে পরিষদের একজন সভাপতি নির্বাচিত হন। সাধারণ পরিষদে প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের একটিমাত্র ভোটদানের অধিকার আছে।

ঘ উদ্দীপকের 'খ' সংস্থা দ্বারা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। বিশ্বশান্তি রক্ষায় নিরাপত্তা পরিষদ সবচেয়ে কার্যকর সংস্থা। মন্তব্যটি যথার্থ।

বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করার মূল দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের ওপর অর্পিত। তাই এর গুরুত্ব সর্বাধিক। আবার আগ্রাসী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক অবরোধ আরোপ করা সহ প্রয়োজনে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করার ক্ষমতাও রয়েছে নিরাপত্তা পরিষদের, যা জাতিসংঘের অন্য কোনো শাখার এখতিয়ারে নেই। তাছাড়া এই পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্যের ভেটো ক্ষমতা রয়েছে। তাই, এটি জাতিসংঘের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী শাখা হিসেবে পরিচিত।

উদ্দীপকের 'খ' সংস্থা আন্তর্জাতিক বিরোধ নিরসন, আগ্রাসী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অবরোধ, প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ, শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন প্রভৃতি শাসন বিভাগীয় কাজ সম্পাদন করে থাকে। এরূপ বর্ণনায় জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের কর্মপরিধি প্রকাশ পেয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদ জাতিসংঘের শাসন বিভাগস্বরূপ। নিরাপত্তা পরিষদ মোট ১৫টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত। বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার মূল দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের। এ পরিষদ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা করে। আগ্রাসী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক অবরোধ আরোপ করতে পারে। এ চেষ্টা ব্যর্থ হলে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করার ক্ষমতা রাখে। তাছাড়া নিরাপত্তা পরিষদ শান্তি প্রতিষ্ঠা ও যুদ্ধ বন্ধের জন্য কোথাও জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন করতে পারে। মোটকথা, আন্তর্জাতিক শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল কাজ এ সংস্থাটি করে থাকে। যা জাতিসংঘের অন্য ৫টি সংস্থা করতে পারে না।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের শাখা খ-সংস্থা অর্থাৎ নিরাপত্তা পরিষদ বিশ্বশান্তি রক্ষায় সবচেয়ে কার্যকর সংস্থা।

মডেল টেস্ট- ০৩

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	M	২	N	৩	K	৪	N	৫	M	৬	L	৭	M	৮	K	৯	K	১০	K	১১	N	১২	K	১৩	N	১৪	L	১৫	M
	১৬	M	১৭	M	১৮	L	১৯	N	২০	M	২১	M	২২	N	২৩	K	২৪	L	২৫	M	২৬	L	২৭	L	২৮	K	২৯	M	৩০	L

সৃজনশীল

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক অধিকার হলো সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত কতকগুলো সুযোগ-সুবিধা, যা ভোগের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে।

খ রাষ্ট্র তার নাগরিকের নিকট থেকে যা কিছু আশা করে তা পালন করাই নাগরিকের কর্তব্য। অর্থাৎ ব্যক্তির করণীয় কাজকে কর্তব্য বলা হয়।

কর্তব্য হলো করণীয় কাজ। কর্তব্য হলো নাগরিকের দায়িত্ব। আইনের দ্বারা স্বীকৃত অধিকার ভোগ করতে গিয়ে নাগরিককে যেসব দায়িত্ব পালন করতে হয় তাকে কর্তব্য বলে। কর্তব্য সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হব হাউজ বলেন, আমার যদি ধাক্কা না খেয়ে পথ চলার অধিকার থাকে তা হলে অপরের কর্তব্য আমার প্রয়োজন মতো জায়গা ছেড়ে দেওয়া। অর্থাৎ কর্তব্য বলতে ব্যক্তির সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের জন্য কোনো কিছু করা বা না করার অধিকারকে বোঝায়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত জাহেদ তার ছাত্রদের পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ে জ্ঞান অর্জনে গুরুত্বারোপ করেন।

পৌরনীতি ও নাগরিকতাকে বলা হয় নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। কারণ নাগরিকতার সাথে জড়িত সকল বিষয় পৌরনীতিতে আলোচনা করা হয়। নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, নাগরিকতার স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়, নাগরিকতার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সবই পৌরনীতি ও নাগরিকতার বিষয়বস্তু। মূলত পৌরনীতি ও নাগরিকতা আদর্শ নাগরিক জীবন সম্পর্কে জ্ঞান দান করে।

উদ্দীপকের শিক্ষক জাহেদ তার ছাত্রদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের জন্য একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করেন। উক্ত বিষয়টি জনগণকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। শিক্ষকের এমন বক্তব্যে নিশ্চিতভাবে পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ের কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কেননা, পৌরনীতি ও নাগরিকতা হলো নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। একটি রাষ্ট্রে বসবাস করতে গিয়ে নাগরিকের যে অধিকার ও কর্তব্যের সম্মুখীন হতে হয় তার বিস্তৃত আলোচনা করে পৌরনীতি ও নাগরিকতা। এ বিষয়টি অধ্যয়নের মাধ্যমে নাগরিক একদিকে নিজের অধিকার সম্পর্কে জানতে পারবে। অন্যদিকে রাষ্ট্রের কল্যাণে তাদের কর্তব্য সম্পর্কেও সচেতন হয়ে উঠবে। ফলে রাষ্ট্রে প্রতিটি নাগরিক সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয় তথা পৌরনীতি ও নাগরিকতা নাগরিকের স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়েও আলোচনা করে।– মন্তব্যটি যথার্থ।

নাগরিকতার বিজ্ঞান হিসেবে পৌরনীতি ও নাগরিকতা নাগরিকের সামগ্রিক জীবনের পর্যালোচনা করে থাকে। নাগরিকের অতীত, বর্তমান অবস্থা কিংবা ভবিষ্যতে নাগরিকতার মর্যাদা কীরূপ হবে তার সবই স্থান পায় পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ের মধ্যে। তাই পরিবর্তিত নাগরিক জীবনের সাথে খাপখাইয়ে চলার জন্য এ বিষয়ের অধ্যয়নের বিকল্প নেই।

উদ্দীপকের বক্তব্যে পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়টির চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। পৌরনীতি নাগরিকের স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। কারণ কোনো ব্যক্তির নাগরিকতার শুরু হয় স্থানীয়ভাবে। একটি পরিবারের, গ্রামের, ইউনিয়নের বা কোনো পৌর এলাকার সদস্য হিসেবে নাগরিকের স্থানীয় রূপের প্রকাশ ঘটে। এসব স্থানীয় সংস্থাগুলোর সদস্য হিসেবে নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্যসমূহের পর্যালোচনা করা পৌরনীতি ও নাগরিকতার বিষয়বস্তু। আবার, ব্যক্তি রাষ্ট্রের একজন সদস্য হিসেবে যখন সে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে এবং বিনিময়ে রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করে তখন তার নাগরিকতার জাতীয় রূপ ধরা পড়ে। এরূপ একজন জাতীয় নাগরিকের মৌলিক অধিকার ও কর্তব্যসমূহ, দেশ রক্ষায় সুনাগরিকের ভূমিকা ও নাগরিক জীবনের বিভিন্নমুখী সমস্যা ও তার সমাধানে পৌরনীতি ও নাগরিকতা আলোচনা করে থাকে। এছাড়া রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে একজন নাগরিক বিশ্ব সমাজের সদস্য। সে হিসেবে কোনো রাষ্ট্রের নাগরিক যখন বিশ্ব সমাজের নিকট থেকে বিভিন্ন প্রকার অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে বিশ্ব সমাজের প্রতি কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয় তখন নাগরিকতার আন্তর্জাতিক রূপ প্রকাশ পায়।

পরিশেষে বলা যায়, পৌরনীতি ও নাগরিকতা নাগরিকের স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়েও আলোচনা করে– প্রশ্নোক্ত এ মন্তব্যটি যথার্থ ও সঠিক।

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রাচীন গ্রিসে নগরকেন্দ্রিক ছোট ছোট রাষ্ট্র ছিল, সেগুলোকে নগররাষ্ট্র বলা হতো।

খ নাগরিকগণ আইন মান্য করে প্রধানত শাস্তির ভয়ে।

নাগরিকগণ সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য আইন মান্য করে। নাগরিকদের অধিকার উপভোগ ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য আইন অপরিহার্য। আইনের উপস্থিতি ছাড়া মানুষের পক্ষে উৎকৃষ্ট জীবন গড়ে তোলা সম্ভব নয়। আইন স্বাধীনতার রক্ষক ও অভিভাবক। তাছাড়া আইন অমান্য করলে প্রত্যেক রাষ্ট্রেই শাস্তির বিধান রয়েছে। এসব কারণেই নাগরিকরা আইন মান্য করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত, জাহিদ হাসানের ছেলেমেয়ে জন্মসূত্রের জন্মস্থান নীতি অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক।

জন্মস্থান নীতি অনুযায়ী পিতামাতা যে দেশেরই নাগরিক হোক না কেন, সন্তান যে রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করবে সে ঐ রাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করবে। যেমন– কোনো বাংলাদেশি পিতামাতার সন্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করলে সেই সন্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করবে। এক্ষেত্রে নাগরিকতা নির্ধারণে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এ নীতি অনুযায়ী কোনো মা-বাবার সন্তান অন্য দেশের জাহাজ, বিমান বা দূতাবাসে জন্মগ্রহণ করলেও জাহাজ, বিমান বা দূতাবাস যে দেশের সে ঐ দেশের নাগরিক হবে। আমেরিকা, কানাডাসহ অল্প কয়েকটি দেশ এ নীতির মাধ্যমে নাগরিকতা নির্বাচন করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জাহিদ হাসান বাংলাদেশের নাগরিক। চাকরির সুবাদে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন করলে সেখানে তার ছেলেমেয়ে জন্মগ্রহণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেহেতু জন্মস্থান নীতিকে অনুসরণ করে, তাই জাহিদ সাহেবের ছেলেমেয়েরা জন্মস্থান তথা জন্মসূত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক।

ঘ উদ্দীপকে মি. জন অনুমোদনসূত্রে এবং জাহিদ হাসানের সন্তানেরা জন্মসূত্রের জন্মস্থান নীতির ভিত্তিতে নাগরিকতা অর্জন করেছেন।

নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি অনুযায়ী জন্মসূত্রে এবং অনুমোদনসূত্রে নাগরিকতা লাভ করা যায়। জন্মসূত্রে আবার জন্মনীতি ও জন্মস্থান নীতি অনুসরণ করা হয় এবং অনুমোদনসূত্রে নাগরিকত্ব পেতে ব্যক্তিকে কতকগুলো সুনির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করতে হয়। অনুমোদনসূত্রে নাগরিকতা পাওয়ার কতকগুলো শর্তের একটি হচ্ছে সংশ্লিষ্ট দেশের সম্পত্তি ক্রয় করা বা বিনিয়োগ করা।

উদ্দীপকে ব্রিটেনের নাগরিক মি. জন এই শর্তটি পূরণ করা সাপেক্ষে বাংলাদেশের একজন অনুমোদনসূত্রীয় নাগরিকে পরিণত হয়েছেন। এমতাবস্থায় তিনি উভয় দেশের নাগরিক হলেও তাকে বর্তমান দেশের

নাগরিকত্ব বজায় রেখেই চলতে হবে। অপরদিকে, বাংলাদেশ জন্মনীতি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জন্মস্থান নীতি মেনে চলে। তাই উদ্দীপকের জাহিদ হাসানের বাংলাদেশি নাগরিকত্বের দরুন তার সন্তানেরা বাংলাদেশি এবং জন্মস্থানের কারণে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করবে। ফলে দ্বৈত নাগরিকত্বের সৃষ্টি হবে এবং প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তাদের যেকোনো একটি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করতে হবে। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগ পর্যন্ত জাহিদ হাসানের ছেলেমেয়ের দুটি দেশে নাগরিকত্ব থাকলেও মি. জনকে কেবলই বাংলাদেশি অথবা ব্রিটিশ পরিচয়ে চলতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, নাগরিকতা অর্জনের জন্মস্থান নীতি ও অনুমোদনসূত্র দুটি আলাদা পদ্ধতি।

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যোগ্যতা অনুযায়ী সমাজের সকল মানুষের সমান সুযোগ লাভ করার সমতাকে সাম্য বলে।

খ ব্যক্তি স্বাধীনতা হলো স্বাধীনতার একটি রূপ।

ব্যক্তিস্বাধীনতা বলতে এমন স্বাধীনতাকে বোঝায় যে স্বাধীনতা ভোগ করলে অন্যের কোনো ক্ষতি হয় না। যেমন– ধর্মচর্চা করা, পারিবারিক গোপনীয়তা রক্ষা করা ইত্যাদি। এ ধরনের স্বাধীনতা, ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব বিষয়।

গ রহমান সাহেবের ধারণা আইনের 'প্রথা' নামক উৎসকে নির্দেশ করে।

প্রথা আইনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস। দীর্ঘকাল যাবৎ কোনো নিয়ম সমাজে চলতে থাকলে তাকে প্রথা বলে। রাষ্ট্র সষ্টির পূর্বে প্রথার মাধ্যমে মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হতো। রাষ্ট্র সৃষ্টির পর যেসব প্রথা রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে সেগুলো আইনে পরিণত হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যুক্তরাজ্যের অনেক আইন প্রথার ওপর ভিত্তি করে সৃষ্টি হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রহমান সাহেব ছোটবেলা থেকে সমাজের নিয়মনীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল। সে বড় হয়ে লক্ষ করে ঐ সকল নিয়মনীতিই এখন মানুষের খারাপ কাজকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এরূপ বর্ণনায় আইনের উৎস হিসেবে প্রথা নামক উৎসটির অস্তিত্ব প্রকাশ পায়। কেননা পৃথিবীর অনেক দেশে সমাজে প্রচলিত এরূপ রীতিনীতি বর্তমানে আইনে পরিণত হয়ে মানুষের অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করছে। সুতরাং আলোচনা থেকে বলা যায়, রহমান সাহেবের ধারণা আইনের প্রথা' নামক উৎসকে নির্দেশ করে।

ঘ ওসমান সাহেবের কাজের মাধ্যমে প্রকাশিত উৎসটিই তথা 'আইনসভা' আইনের প্রধান উৎস –উক্তিটি যৌক্তিক।

আধুনিককালে আইনের প্রধান উৎস হচ্ছে আইনসভা। জনমতের সাথে সংগতি রেখে বিভিন্ন দেশের আইনসভা নতুন আইন প্রণয়ন করে। তাছাড়া আইনসভা পুরাতন আইনকেও সংশোধন করে যুগোপযোগী করে তোলে। অতএব, আইনের উৎস হিসেবে আইনসভার গুরুত্ব অপরিসীম।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ওসমান সাহেব তার নির্বাচনি এলাকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে সারাদেশের জন্য প্রযোজ্য নিয়মাবলি তৈরি ও পুরাতন নিয়মাবলিকে যুগোপযোগী করেন। অর্থাৎ তিনি আইনসভার সদস্য। যেটি আইনের অন্যতম এবং গুরুত্বপূর্ণ উৎস। একটি দেশে আইনসভা হলো জনপ্রতিনিধিদের সভাস্থল। এটি সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সম্মতিক্রমে যেকোনো নতুন আইন প্রণয়ন, প্রচলিত আইনের পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারে। আইনসভা সর্বদা জনমতের সাথে সম্মতি রেখে এসব কাজ পরিচালনা করে বিধায় এটি বর্তমান সময়ে আইনের প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচিত।

পরিশেষে বলা যায়, আধুনিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে আইনসভা হলো জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান। আর তাই আইনের উৎস হিসেবে এর গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত।

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জনগণ সবকিছুর নিয়ন্ত্রক তাকে গণতন্ত্র বলে।

খ যে রাষ্ট্র জনগণের দৈনন্দিন ন্যূনতম চাহিদা পূরণের জন্য কল্যাণমূলক কাজ করে তাকে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলে।

কল্যাণমূলক রাষ্ট্র জনকল্যাণের জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেগুলো হলো– নাগরিকের পাঁচটি মৌলিক চাহিদা (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা) পূরণের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, বেকারভাতা প্রদান, বিনা খরচে শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। এছাড়াও কল্যাণমূলক রাষ্ট্র জনকল্যাণের জন্য নাগরিকদের সামাজিক নিরাপত্তা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। এসব কারণে সবার কাছে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র একান্ত কাম্য।

গ আমিন সাহেবের সংগঠনটির সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থার মিল পাওয়া যায়।

যে শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা রাষ্ট্রের সকল সদস্য তথা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে, তাকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে। এটি এমন একটি শাসনব্যবস্থা যেখানে শাসনকার্যে জনগণের সকলে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং সকলে মিলে সরকার গঠন করে। এছাড়াও নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় অর্থাৎ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তিত হয়। গণতন্ত্রে জনগণের আস্থার ওপর সরকারের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। ফলে জনগণের আস্থা লাভের জন্য সরকার সততার সাথে দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করে। এর ফলে সরকারের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

উদ্দীপকের জনাব আমিন "সোনার বাংলা" সংগঠনের প্রধান। তিনি সংগঠনের অধীনস্থ সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মতামতের উপর ভিত্তি করে সংগঠনটি সফলতার সাথে পরিচালনা করেন। এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় আমিন সাহেবের 'সোনার বাংলা' সংগঠনটির প্রকৃতির সাথে গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থার সাদৃশ্য রয়েছে। কারণ গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা হলো সকলের মতামতের ভিত্তিতে গঠিত সরকারব্যবস্থা।

ঘ "সোনার তরী" সংগঠনটির সাথে একনায়কতান্ত্রিক সরকারের সাদৃশ্য রয়েছে। এ ধরনের সরকারে রাষ্ট্রপ্রধান সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী বিধায় তিনি স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠেন।

একনায়কতন্ত্র এক ধরনের স্বেচ্ছাচারী শাসনব্যবস্থা। এতে রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত না থেকে একজন স্বেচ্ছাচারী শাসক বা দল বা শ্রেণির হাতে ন্যস্ত থাকে। এতে নেতাই দলের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তাকে বলা হয় একনায়ক বা ডিকটেটর। একনায়কতান্ত্রিক শাসককে সহায়তা করার জন্য মন্ত্রী বা উপদেষ্টা পরিষদ থাকে। কিন্তু তারা শাসকের আদেশ ও নির্দেশ মেনে চলে। একনায়কের আদেশই আইন।

উদ্দীপকের জনাব আজিম "সোনার তরী" নামক সংগঠনের প্রধান। সংগঠন পরিচালনার জন্য অধীনস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মতামতের প্রাধান্য দেন না। তিনি উক্ত সংগঠনটির সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। অর্থাৎ জনাব আজিম হলেন একনায়কতান্ত্রিক সরকারের স্বেচ্ছাচারী সরকার প্রধান। যে কারণে তিনি সারাদেশে স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কারও কাছে জবাবদিহিও করেন না। এ শাসনব্যবস্থা একক নেতার নেতৃত্বে চলে এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জগণের অংশগ্রহণেরও সুযোগ থাকে না।

আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সরকার প্রধান হলেন প্রকৃত শাসক, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। একারণে তিনি সর্বদা স্বেচ্ছাচারী মনোভাব পোষণ করেন।

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সংবিধান সহজে পরিবর্তন বা সংশোধন করা যায় না, তাকে দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান বলে।

খ সঠিকভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সংবিধান প্রয়োজন।

সংবিধান হলো রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক দলিল। সংবিধান ব্যতীত কোনো রাষ্ট্র সঠিকভাবে পরিচালিত হতে পারে না। সংবিধান নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্যের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দান করে। রাষ্ট্রের আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ কীভাবে গঠিত হবে, এদের গঠন ও ক্ষমতা কী হবে, জনগণ রাষ্ট্র প্রদত্ত কী কী অধিকার ভোগ করবে এবং জনগণ ও সরকারের সম্পর্ক কেমন হবে– এসব বিষয় সংবিধানে উল্লেখ থাকে। এসব বিষয়ের ওপর ভিত্তি করেই দেশ পরিচালিত হয়।

গ দৃশ্যকল্প-১ দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানকে নির্দেশ করে।

সংশোধনের ভিত্তিতে সংবিধান দুই প্রকার। যথা– সুপরিবর্তনীয় সংবিধান ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান। দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের কোনো নিয়ম সহজে পরিবর্তন বা সংশোধন করা যায় না। এক্ষেত্রে সংবিধান পরিবর্তন বা সংশোধন করতে হলে জটিল পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়। সাধারণ

সংখ্যাগরিষ্ঠতায় এ ধরনের সংবিধান পরিবর্তন করা যায় না। প্রয়োজন হয় বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা, সম্মেলন ও ভোটাভুটির।

উদ্দীপকে রাংটিয়া গ্রামের মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য গ্রামবাসী 'গোলাপ' নামের একটি সমবায় সমিতি গঠন করে। ঐ সমিতির নিয়ম-কানুন সহজেই সদস্যদের নিকট বোধগম্য। পরিচালনার দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তিরা ইচ্ছা করলেই নিয়ম পরিবর্তন করতে পারে না। এসব তথ্য দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, দৃশ্যকল্প-১ দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানকে নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকে দৃশ্যকল্প-১ ও দৃশ্যকল্প-২ এর সংবিধান হচ্ছে যথাক্রমে দুষ্পরিবর্তনীয় ও সুপরিবর্তনীয় সংবিধান। উভয় সংবিধানের মধ্যে আমার কাছে দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানটি উত্তম বলে মনে হয়।

সংশোধনের ভিত্তিতে সংবিধান দুই প্রকার। যথা– সুপরিবর্তনীয় সংবিধান ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান। সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের কোনো নিয়ম সহজে পরিবর্তন বা সংশোধন করা যায়। এ ক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধন বা পরিবর্তন করতে কোনো জটিলতার প্রয়োজন হয় না। সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় আইনসভা এর যেকোনো অংশ সংশোধন করতে পারে। অন্যদিকে, যে সংবিধানের কোনো ধারা সহজে পরিবর্তন বা সংশোধন করা যায় না, এ ক্ষেত্রে সংবিধান পরিবর্তন বা সংশোধন করতে হলে জটিল পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়, তাকে দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান বলা হয়। সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় এ ধরনের সংবিধান পরিবর্তন করা যায় না। প্রয়োজন হয় বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা, সম্মেলন ও ভোটাভুটির।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২ এর সংবিধানটি দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান হিসেবে বিবেচিত। আমরা জানি, উত্তম সংবিধানের কোনো ধারার সংশোধন বা পরিবর্তন নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হয়। অর্থাৎ এ সংবিধানে সংশোধন পদ্ধতি উল্লেখ থাকে। সংবিধানের কোন অংশ কীভাবে সংশোধন করা হবে তা উত্তম সংবিধানে উল্লেখ থাকে। দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান সাধারণত উত্তম প্রকৃতির হয়, যাকে সংশোধন বা পরিবর্তন পদ্ধতি লিখিত থাকে এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে তা হয়ে থাকে। অধিকন্তু দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান লিখিত, সুস্পষ্ট ও বোধগম্য হয়ে থাকে।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে দৃশ্যকল্প-১ ও দৃশ্যকল্প-২ এর সংবিধানের মধ্যে দৃশ্যকল্প-২ তথা দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানটি উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য বহন করে। তাই আমার কাছে এই সংবিধানটি অধিক গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত।

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ ব্যক্তি হলেন রাষ্ট্রপতি।

খ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলতে সেই ধরনের সরকারকে বোঝায়, যেখানে একাধিক অঞ্চল বা প্রদেশ মিলে একটি সরকার গঠন করে।
যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ক্ষমতা গঠনের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এতে সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার কিছু অংশ প্রদেশ বা আঞ্চলিক সরকারের এবং জাতীয় বিষয়গুলো কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে। অর্থাৎ এতে দ্বৈত সরকারব্যবস্থা থাকে।

গ জনাব আনোয়ার হোসেনের সাথে বাংলাদেশের সরকারের প্রধানমন্ত্রীর মিল রয়েছে।
সংসদীয় সরকারব্যবস্থার প্রধান ও প্রকৃত নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী হলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। সরকারের যাবতীয় কার্যাবলি রাষ্ট্রপতির নামে পরিচালিত হলেও মূলত প্রধানমন্ত্রী সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। এজন্য সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলি ব্যাপক।
উদ্দীপকের আনোয়ার সাহেব শুভনীয় ক্লাবের সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে নির্বাহী পদে কর্মরত। ২৫ বছর বয়স হলেই যে কোনো সদস্য উক্ত পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। এরূপ বর্ণনা বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীকে উপস্থাপন করে। প্রধানমন্ত্রী হলেন বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার প্রকৃত শাসক। মন্ত্রিপরিষদের সহযোগিতায় তিনি শাসনসংক্রান্ত সকল দায়িত্ব পালন করেন। তার পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি মন্ত্রী, রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, বিদেশে রাষ্ট্রদূত ইত্যাদি নিয়োগ দেন। তাকে কেন্দ্র করে মন্ত্রিসভা গঠিত, পরিচালিত ও বিলুপ্ত হয়। প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদের একজন সদস্য ও সংসদ নেতা। তিনি সংসদে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তার নেতৃত্বে সংসদে আইন প্রণয়ন করা হয়। তিনি জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান, স্থগিত বা ভেঙে দিতে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেন। প্রধানমন্ত্রী জাতীয় স্বার্থের রক্ষক। জাতীয় স্বার্থে তিনি বিভিন্ন সময়ে বক্তৃতা ও বিবৃতির মাধ্যমে জনগণকে রাষ্ট্রীয় কর্মসূচি সম্পর্কে অবহিত করেন ও জনগণের মধ্যে সংহতি রক্ষায় কাজ করেন।

ঘ উদ্দীপকের শুভনীয় ক্লাবের চেয়ারম্যানের সাথে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির মিল রয়েছে।– উক্তিটির সাথে আমি একমত।
বাংলাদেশের শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ ব্যক্তি হলেন রাষ্ট্রপতি। তিনি সংসদ সদস্যদের ভোটে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। তাঁর মেয়াদ হলো পাঁচ বছর। বাংলাদেশের যেকোনো নাগরিক ৩৫ বছর বয়স হলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন।
উদ্দীপকে বলা হয়েছে, শুভনীয় ক্লাবের সভাপতি সদস্যদের পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত। সভাপতির মেয়াদকাল ৩৫ বছর। ৩৫ বছর বয়স হলেই উক্ত ক্লাবের সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে এবং বলা হয়েছে দ্বায়িত্ব পালনকালে তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনা যাবে না। উদ্দীপকের এরূপ বর্ণনায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠে। কেননা বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদসের ভোটে নির্বাচিত হন। তাঁর কার্যকাল পাঁচ বছর। তিনি ২ মেয়াদের বেশি অর্থাৎ ১০ বছরের বেশি রাষ্ট্রপতি পদে থাকতে পারেন না। রাষ্ট্রপতি থাকা অবস্থায় তার বিরুদ্ধে আদালতে কোনো অভিযোগ আনা যায় না। তবে সুনির্দিষ্ট অভিযোগে অভিশংসন করা যায়। রাষ্ট্রপতি হতে হলে তাকে অবশ্যই ৩৫ বছর বয়স্ক, বাংলাদেশি নাগরিক ও সংসদ সদস্য হওয়ার যোগ্যতা থাকতে হবে।
আলোচনার পরিশেষে এটা সহজেই অনুমিত হয় শুভনীয় ক্লাবের চেয়ারম্যান বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির প্রতিচ্ছবি। তিনি নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান হলেও তিনিই রাষ্ট্রীয় প্রধান এবং জাতীয় সম্মানের প্রতীক।

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক নির্বাচন হলো প্রতিনিধি বাছাইয়ের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া।

খ নির্বাচন পদ্ধতির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হচ্ছে– 'এক ব্যক্তি, এক ভোট' পদ্ধতি।
'এক ব্যক্তি, এক ভোট' বর্তমানে সর্বত্র গৃহীত নীতি। এ পদ্ধতিতে একটি আসনের জন্য যেকোনো সংখ্যক প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। একজন ভোটার কেবল তার পছন্দের প্রার্থীকে একটি ভোট দিবেন। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে, যিনি বেশি ভোট পাবেন তিনি নির্বাচিত হবেন। অর্থাৎ 'এক ব্যক্তি, এক ভোট' বলতে একজন ব্যক্তির একটিমাত্র ভোটপ্রদানকেই বোঝায়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি হলো নির্বাচন কমিশন।
নির্বাচন হলো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিত্তি। আর নির্বাচনকে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ করার জন্য সংবিধানে নির্বাচন কমিশন গঠনের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। সংবিধানের আলোকে নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও সুন্দর করতে কমিশন যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।
উদ্দীপকে বলা হয়েছে, 'ক' রাষ্ট্রের জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য একটি স্বাধীন কমিশন রয়েছে। উক্ত কমিশন স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সকল নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করেন। সুতরাং এটি নিঃসন্দেহে নির্বাচন কমিশন।
নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ সংবিধানের ১১৮নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অনধিক চারজন কমিশনারসহ মোট পাঁচজন নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত। এদেরকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দেন। নির্বাচন কমিশনের সভায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার সভাপতির কাজ করেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারের মেয়াদ তাদের কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে পাঁচ বছর। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা সরকার ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের কর্তব্য। নির্বাচন কমিশন সংবিধানে বর্ণিত নির্দেশনাবলি এবং দেশের নির্বাচনি আইন দ্বারা পরিচালিত হয়। নির্বাচন কমিশনের কার্যাদি সম্পন্ন করার জন্য নিজস্ব সচিবালয় রয়েছে।

ঘ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে উক্ত প্রতিষ্ঠানটির তথা নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা মুখ্য।– মন্তব্যটি যথার্থ।

সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনব্যবস্থা গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ। আর এ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব থাকে নির্বাচন কমিশনের ওপর। নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করতে কমিশন নানা রকম কর্মসূচি প্রণয়ন করে থাকে। এর মাধ্যমে মূলত তারা গণতন্ত্রকে সুসংহত করার পথ তৈরি করে দেয়।

গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণের পূর্বশর্ত হচ্ছে কার্যকর নির্বাচনব্যবস্থা। এ কমিশনের দায়িত্ব হলো নির্বাচনের উপর জনগণের আস্থা অর্জনের জন্য নির্বাচন পরিচালনা, ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ, ভোটারদের পরিচয়পত্র প্রদান, আইনকর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য সকল নির্বাচন পরিচালনা ও আনুষঙ্গিক কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা। নির্বাচনে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র বাছাইকরণ, দল সম্পর্কিত নীতিমালা ও নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজও নির্বাচন কমিশন করে থাকে। নির্বাচন কমিশনের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ করা। এছাড়াও নির্বাচনি আইন তৈরি করে নির্বাচন কমিশন প্রার্থীদের দুর্নীতির পথকে বন্ধ করে দেয়। এ কারণে নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়ে থাকে।

উক্ত আলোচনার পর এ কথা বলা যায়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশনের কোনো বিকল্প নেই।

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে প্রশাসনের প্রশাসককে কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োগ দেয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ বাস্তবায়নই এর প্রধান কাজ, তাকে স্থানীয় প্রশাসন বলে।

খ সরকারি ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং এ বিষয়ে নাগরিক সচেতনতা সৃষ্টির জন্য স্থানীয় সরকারের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

স্থানীয় সরকার স্থানীয় পর্যায়ে নাগরিকদের যথাযথভাবে বিভিন্ন সেবা প্রদান করতে পারে। কেন্দ্রীয় প্রশাসকদের পক্ষে সঠিকভাবে স্থানীয় জনগণের স্বার্থরক্ষা, তাদের সমস্যা সমাধান করা এবং স্থানীয় উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা অর্জন করা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে তাদের স্থানীয় সরকারের উপর নির্ভর করতে হয়। সর্বোপরি কেন্দ্রীয় সরকারকে যথাযথ নীতিমালা গ্রহণ ও উন্নয়ন কর্মকাড বাস্তবায়ন করার জন্য তাই স্থানীয় সরকারের প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক।

গ জনাব চৌধুরী পৌরসভা নামক স্থানীয় সরকারের প্রধান।

গ্রামে যেমন ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামের সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখে, তেমনি শহরাঞ্চলের জন্য রয়েছে পৌরসভা। বর্তমানে বাংলাদেশে ৩৩০টি পৌরসভা রয়েছে।

উদ্দীপকের জনাব চৌধুরী একটি সংস্থার প্রধান। সারা বাংলাদেশে যার সংখ্যা ৩২৫টি। এ থেকেই বোঝা যায় তিনি স্থানীয় সরকারের অন্যতম একটি শাখা পৌরসভার প্রধান। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ অনুযায়ী একটি পৌরসভা কমপক্ষে ৯টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত হবে। তবে আয়তন ও লোকসংখ্যা অনুযায়ী পৌরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা বেশি হতে পারে। এ বিষয়ে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। আইন অনুযায়ী একজন মেয়র প্রতি ওয়ার্ড থেকে একজন করে কাউন্সিলর এবং প্রতি ৩টি ওয়ার্ড থেকে একজন করে মহিলা সদস্য সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। পৌরসভার মেয়র কাউন্সিলর হিসেবে গণ্য হন।

পৌরসভার মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বছর। পৌরসভা গঠনের পর প্রথম সভার তারিখ হতে পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বছর পর্যন্ত উক্ত পৌরসভার মেয়াদ থাকবে। তবে আইন অনুযায়ী মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও নির্বাচিত নতুন প্রতিনিধিদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত পূর্ববর্তী মেয়র ও কাউন্সিলরগণ দায়িত্ব চালিয়ে নিয়ে যাবেন।

[বি. দ্র. বোর্ড বই ২০২২ অনুযায়ী পৌরসভার সংখ্যা ৩৩০টি]

ঘ জনাব চৌধুরীর শেষোক্ত কাজ দুটি হলো– রাস্তার সৌন্দর্যবর্ধনে বৃক্ষরোপণ এবং খাদ্য ভেজাল প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ। পৌরসভার এ দুটি কাজের গুরুত্ব অত্যন্ত ব্যাপক।

পৌরসভা শহরের জনগণের স্থানীয় নানাবিধ সমস্যা সমাধানে এবং উন্নয়নমূলক কাজে দায়িত্ব পালন করে। এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে পৌরসভাকে বহুবিধ কাজ করতে হয়। এসব কাজ শহরের পরিবেশ উন্নয়নের পাশাপাশি জনগণের জীবনমান উন্নয়নেও সহায়তা করে।

উদ্দীপকের জনাব চৌধুরী পৌরসভার প্রধান হিসেবে নানাবিধ দায়িত্ব পালন করেন যার মধ্যে দুটি কাজ হলো উদ্দীপকে উল্লিখিত বৃক্ষরোপণ ও ভেজাল প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ। এ দুটি কাজের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। কারণ বৃক্ষরোপণ পৌরসভার পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও সৌন্দর্যবর্ধনে সহায়তা করে। এরূপ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির ফলে একদিকে যেমন বনায়ন বৃদ্ধি ঘটে তেমনি তা দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় ভূমিকা রাখে। অন্যদিকে খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে জনগণের সুস্বাস্থ্যের বিষয়টি নিশ্চিত হয়। এভাবে জনাব চৌধুরীর মতো প্রতিটি পৌরসভার প্রধান ভেজাল প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এই মারাত্মক সামাজিক সমস্যাটি সমাজ থেকে চিরতরে দূরীভূত হবে।

উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, বৃক্ষরোপণ ও ভেজাল প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ– জনাব চৌধুরীর এ কাজ দুটি একই সাথে জনগণের স্বাস্থ্য রক্ষা এবং পরিবেশের ভারসাম্য নিশ্চিত করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের জন্মহার মৃত্যুহারের তুলনায় অধিক হয়ে যখন বর্ধিত জনসংখ্যা দেশের সম্পদ বৃদ্ধিকে ছাড়িয়ে যায় এবং বিভিন্নমুখী সমস্যা সৃষ্টি করে, তখন তাকে জনসংখ্যা সমস্যা বলে।

খ নিরক্ষর বলতে সেই ব্যক্তিকে বোঝায়, যার কোনো অক্ষরজ্ঞান নেই, এমনকি যিনি তার নাম পর্যন্ত লিখতে পারেনা।

লেখাপড়া না জানার কারণে নিরক্ষর ব্যক্তি রাষ্ট্র ও সমাজের কোনো উপকারে আসে না। বরং নিরক্ষরতার দরুন তারা অজ্ঞতায় নিমজ্জিত থাকে, যা বিভিন্ন সামাজিক ও নাগরিক সমস্যার সৃষ্টি করে। ফলে সমাজের উন্নয়ন ব্যাহত হয়। এ কারণেই নিরক্ষর ব্যক্তি সমাজের জন্য বোঝাস্বরূপ।

গ উদ্দীপকের কামাল ও রোকসানার ঘটনা জনসংখ্যা বৃদ্ধির বাল্যবিবাহ কারণকে নির্দেশ করে।

আমাদের দেশে ২১ বছরের কম বয়সী ছেলে এবং ১৮ বছরের কম বয়সী মেয়ের বিবাহকে বাল্যবিবাহ বলে। বাল্যবিবাহ বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম একটি কারণ। বিবাহকে আমাদের দেশে একটি ধর্মীয় কর্তব্য মনে করা হয়। এ কর্তব্যবোধের তাড়নাসহ বিভিন্ন আর্থসামাজিক কারণে এদেশে বাল্যবিবাহের তৎপরতা উল্লেখযোগ্য হারে বেশি। বাল্যবিবাহের ফলে স্ত্রী প্রায় তার পুরো সক্ষমতার সময় জুড়ে সন্তান জন্মদানের সুযোগ লাভ করে। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, কামাল ও রোকসানার সংসারে মেয়ে ও তিন ছেলে। রিকশাচালক কামালের সাথে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পরপরই রোকসানার বিয়ে হয়। অর্থাৎ ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার বেশ আগেই রোকসানার বিয়ে হয়, যা বাল্যবিবাহের ধারণার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, কামাল ও রোকসানার ঘটনা বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বাল্যবিবাহ কারণকেই নির্দেশ করে।

ঘ আমি মনে করি শেফালী ও শেলীর ক্ষেত্রে নারী নির্যাতনের একই ঘটনা বিদ্যমান নয় বরং ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা বিদ্যমান।

বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের অন্যতম কারণ হলো কন্যা শিশুদের উপেক্ষা। অনেক পরিবারেই পুত্র সন্তানের জন্য যথাসাধ্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা হলেও কন্যা সন্তানের জন্য ততখানি করা হয় না। অল্প বয়সেই মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়, যাতে তার জন্য পড়ালেখার ব্যয় কমানো যায়। এছাড়াও বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের আরেকটি কারণ হলো পুরুষের আধিপত্য। নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্য যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। একই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে পুরুষরা নারীদের যথাযথ মর্যাদা দিতে অবহেলা করে।

উদ্দীপকে উল্লেখিত শেফালী স্বামীর আয়ের টাকা দিয়ে মায়ের জন্য একটি শাড়ি কেনে বলে তাকে বকাঝকা করেছে। এরূপ ঘটনার পেছনে পুরুষের আধিপত্য বিস্তার ও নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অভাব দায়ী। অন্যদিকে পুত্র সন্তান না হওয়ায় শেলীকে তার স্বামী দায়ী করছে। অথচ পুত্র বা কন্যা সন্তান হওয়ার ক্ষেত্রে কেবল স্ত্রী দায়ী থাকেন না, কখনো কখনো স্বামীও দায়ী থাকেন। যখন স্বামী দায়ী থাকেন তখন তা নিয়ে সাধারণত কোনো ধরনের উচ্চবাচ্য করা হয় না। যদিও সন্তান না হওয়ার কারণে নারী-পুরুষ কাউকেই দায়ী করে কোনো ধরনের নির্যাতন চালানো যাবে না। সুতরাং দেখা

যায়, শেলী কন্যা শিশুদের উপেক্ষার কারণে এবং শেফালী পুরুষের আধিপত্যের কারণে নির্যাতনের শিকার হয়েছে।

উপরের আলোচনা শেষে আমি মনে করি শেলী ও শেফালী উভয়ই নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে একটি ঘটনা নয় বরং ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা তথা বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে নারী নির্যাতনের শিকার।

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাধারণ মানুষের সম্মিলিতভাবে সংঘটিত আন্দোলন হলো গণআন্দোলন।

খ ছয় দফা দাবীতে বাঙালির স্বায়ত্বশাসনের ও মুক্তির দাবী সন্নিবেশিত ছিল বলে একে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বলে।

১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরে বিরোধী দলের এক কনভেনশনে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার ঐতিহাসিক ৬ দফা কর্মসূচি উত্থাপন করেন। কার্যত এ ৬ দফাতে পাকিস্তানি ধাঁচের বৈষম্যমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ভেঙে বাঙালি জাতির মুক্তি বা স্বাধীনতা কেন্দ্রীভূত ছিল। আর তাই এ ৬ দফাকে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বা ম্যাগনাকার্টা বলা হয়।

গ উদ্দীপকের উল্লিখিত সরকারটি হলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন গঠিত মুজিবনগর সরকার।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন প্রবাসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয়। এটি ইতিহাসে মুজিবনগর সরকার নামে পরিচিত। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে মুজিবনগর সরকার গঠন ছিল একটি যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ঘটনা। কেননা এ সরকারই মুক্তিযুদ্ধে বেসামরিক বা রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়েছিল।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, ১৯৭১ সালে 'ক' অঞ্চলের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিরোধ আন্দোলন চলছিল অপরিকল্পিতভাবে। 'ক' অঞ্চলে অস্থায়ী সরকার গঠিত হওয়ার পর থেকে উক্ত সংগ্রাম সংগঠিতভাবে পরিচালিত হতে থাকে। এসব তথ্যের আলোকে ঐতিহাসিক মুজিবনগর সরকারের চিত্র ফুটে ওঠে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে গতিময় ও সুসংহত করা এবং ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী বাঙালিকে দেখাশুনা ও বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতার যৌক্তিকতা তুলে ধরার জন্য ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার অর্থাৎ মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়। ১৭ এপ্রিল এ সরকার শপথ গ্রহণ করে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ প্রশাসন পরিচালনার জন্য মুজিবনগর সরকারকে ১২টি মন্ত্রণালয়ে ভাগ করা হয়, যা মুক্তিযুদ্ধে সাফল্য অর্জনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে।

ঘ উদ্দীপকের স্বাধীনতা সংগ্রামটি তথা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনায় ১৯৭১ সালে গঠিত মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা কোনোদিন ভুলবার নয়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন প্রবাসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয়, যা ইতিহাসে মুজিবনগর সরকার নামে পরিচিত। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে মুজিবনগর সরকার গঠন ছিল একটি যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ঘটনা। কেননা এ সরকারই মুক্তিযুদ্ধে বেসামরিক বা রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়েছিল।

উদ্দীপকে বর্ণিত সরকারের সাথে মুজিবনগর সরকারের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন এ সরকারের অবদান কোনোদিন ভুলবার নয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে গতিময় ও সুসংহত করা এবং ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী বাঙালিকে দেখাশুনা ও বহির্বিশ্বে বাঙালি জাতির ভাবমূর্তি তুলে ধরার জন্য ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার অর্থাৎ মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়। ১৭ এপ্রিল এ সরকার শপথ গ্রহণ করে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ প্রশাসন পরিচালনার জন্য মুজিবনগর সরকারকে ১২টি মন্ত্রণালয়ে ভাগ করা হয়, যা মুক্তিযুদ্ধে সাফল্য অর্জনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ক্ষেত্রে মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক কার্যক্রম ছিল অত্যন্ত কার্যকর। এ সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে বিদেশিদের সমর্থন আদায়ে ব্যাপক তৎপরতা চালায়। কূটনৈতিক তৎপরতার দরুন মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমর্থন আদায় করা সম্ভব হয়েছিল, যা আমাদের স্বাধীনতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এছাড়া পুরো নয় মাস জুড়ে এ সরকার মুক্তিযুদ্ধকে সঠিকপথে এবং সঠিক পরিকল্পনায় পরিচালিত করে মুক্তিযুদ্ধে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সহায়তা করে।

আলোচনার পরিশেষে তাই বলা যায়, মুক্তিযুদ্ধকালীন যুদ্ধ পরিচালনা ও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে মুজিবনগর সরকার ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারকদের কার্যকাল নয় বছর।

খ জাতিসংঘের উদ্দেশ্যগুলো হলো– শান্তির প্রতি হুমকি ও আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ প্রতিরোধ করে বিশ্বের শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

সব মানুষের সমান অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের মধ্যে সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা; অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবসেবামূলক সমস্যার সমাধানে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গড়ে তোলা; জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের প্রতি সম্মান এবং শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলা এবং আন্তর্জাতিক আইনের সাহায্যে আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসা করা।

গ আবদুর রব সাহেবের কর্মরত সংস্থাটি হলো সার্ক।

সদস্যভুক্ত দেশগুলোর পারস্পরিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সার্ক নানাবিধ কার্যাবলি সম্পাদন করে। ১৯৮৫ সালের ৮ই ডিসেম্বর দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি উন্নয়নশীল দেশ নিয়ে গঠিত আঞ্চলিক জোট হলো সার্ক, যার উদ্দেশ্য সদস্যরাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে অগ্রগতি সাধন। সার্ক এর এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে সংস্থাটি বিভিন্ন কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সার্কের একজন প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে আবদুর রব সাহেব রহমতপুর গ্রামের বন্যা নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা রাখেন। এমনিভাবে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের কল্যাণ সাধন ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সার্ক কাজ করে । সদস্যরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বিদ্যমান সংকট সমাধানে সার্ক অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া সদস্য দেশগুলোর মধ্যে মানবপাচার রোধ, সন্ত্রাস দমন, পরিবেশ সংরক্ষণ, যোগাযোগ ও প্রযুক্তির উন্নয়ন, রোগ-ব্যাধি ও দারিদ্র্য দূরীকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বিভিন্ন সহযোগিতামূলক ক্ষেত্রে সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্য দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তি বাস্তবায়িত হচ্ছে। সার্কভুক্ত দেশগুলোতে কৃষি, বনায়ন, শিক্ষা, উপকূলীয় এলাকা ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র, রোগ নিরাময় কেন্দ্র ইত্যাদি বিষয়ক অঙ্গসংগঠন পরিচালনার মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি স্থাপনে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে সার্ক।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত উন্নয়নশীল দেশগুলোর ভাগ্যোন্নয়নে সার্ক-এর মতো এ ধরনের সংস্থা গড়ে তোলা খুবই জরুরি বলে আমি মনে করি।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সাধারণত ধীরগতিতে আর্থসামাজিক অগ্রগতি চলমান থাকে। এসব দেশে বিদ্যমান সম্পদ ও সম্ভাবনা খুব বেশি অপর্যাপ্ত না হলেও অদক্ষ ব্যবস্থাপনা ও প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন বিষয়ের অভাবে সেসব সম্পদ ও সম্ভাবনার পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার বিঘ্নিত হয়। তাই দেশগুলো নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার লক্ষ্যে জোটভুক্ত হয়ে উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বাংলাদেশের রহমতপুর একটি নিচু ও প্লাবন- সমভূমি, যা সামান্য বন্যা হলেই ডুবে যায়। আর বন্যার্তদের সাহায্যের জন্য অন্যান্য সাহায্যদানকারী সংস্থার মতো সার্ক প্লাবিত অঞ্চলের মানুষদের জন্য এগিয়ে আসেন। উদ্দীপকের সার্কের ন্যায় আঞ্চলিক জোটগুলো জোটভুক্ত দেশসমূহের মধ্য পারস্পরিক সহযোগিতার বন্ধন স্থাপন করে বিধায় দেশগুলো পারস্পরিক ঘাটতি পূরণে সক্ষম হয়। ফলে, আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়। আবার, পারস্পরিক সুসম্পর্কের মাধ্যমে জোটভুক্ত দেশগুলো নিজেদের মাঝে বিদ্যমান বিবাদ মিটিয়ে ফেলতে সক্ষম হয় এবং উন্নয়নের সহযাত্রী হিসেবে বন্ধুতে পরিণত হয়। আঞ্চলিক জোট গঠন করা হলে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটে, ভারসাম্য অর্জিত হয় এবং বিভিন্ন নাগরিক সমস্যার সমাধানে সক্ষমতা অর্জিত হয়। ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলোর ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটে।

আলোচ্য বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রেক্ষিতে এ জাতীয় আঞ্চলিক জোটগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আর তাই আমি মনে করি উদ্দীপকে উল্লিখিত উন্নয়নশীল দেশগুলোর ভাগ্যোন্নয়নে আঞ্চলিক সংস্থা গড়ে তোলা জরুরি।